পরিচয়

আষাঢ় । ১৩৬৮

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়


আধুনিক পরিবারে অভিনব সার্ফ
'আমাদের আজকের
জীবনে...'
বোম্বের গৃহিণী প্রেমা সুন্দরজী বলেন
'আমাদের আধুনিক এই জীবনযাত্রায় মনে হয় রোজই নতুন জিনিষ চাই, আর কালকের চেয়ে আরও ভাল জিনিষ চাই'—বোম্বের ওয়াল-কেশ্বর রোডের শ্রীমতী প্রেমা জি. সুন্দরজীর অভিমত। 'এই সার্ফের কথাই ধরুন। আমার বাড়ীর সব কাপড় চোপড়ই—সার্ট, প্যান্ট, শাড়ী, ব্লাউজ, তোয়ালে চাদর সবই সার্ফে কেচে চমৎকার ফরসা হয়!'
সার্ফে সহজেই কাপড় ধব্‌ধবে ফরসা হবে। আজ নিজেই একবারটি পরখ করে দেখুন!
সার্ফে কাপড়জামা
সবচেয়ে ফরসা করে কাচে
Surf
Surf
AMAZING BLUE POWDER
FOR THE CLEANEST WASH EVER!
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী
SU. 18-X29 BG

সাধনা ঔষধালয়ের পক্ষ হইতে ডাঃ রায়কে স্বর্ণ নির্মিত স্টেথেস্কোপ উপহার



শনিবার ১লা জুলাই মহাজাতি সদনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ৮০তম জন্মজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে সাধনা ঔষধালয়ের স্বত্বাধিকারী এবং ডাঃ রায়ের ছাত্র ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ সাধনা ঔষধালয়ের পক্ষে ডাঃ রায়কে একটি মানপত্র ও রৌপ্যাধারে স্বর্ণ নির্মিত স্টেথেস্কোপ উপহার দেন।

পরিচয়

৩০ বর্ষ; ১২শ সংখ্যা

আষাঢ়, ১৮৮৩; ১৩৬৮

'শিশুতীর্থে'র পরিপ্রেক্ষিত

অশ্রুকুমার সিকদার

এক

রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত কবিতাসমূহের মধ্যে তিনটি স্পষ্টতই যীশুখ্রীষ্টের জীবন ও বাণী অবলম্বনে রচিত। তার মধ্যে দুটি মৌলিক রচনা—'মানবপুত্র' এবং 'শিশুতীর্থ'; অপরটি, 'তীর্থযাত্রী', এলিয়টের 'Journey of the Magi' কবিতার অনুবাদ। এই কবিতাগুলির রচনাকাল ১৩৩৮-৩৯ সাল। সমসাময়িককালে ঐ বিষয় অবলম্বনে তিনি আরো দুটি কবিতা রচনা করেন, একটি 'বড়োদিন', অপরটি 'পূজালয়ের অন্তরে এবং বাহিরে'—সে দুটি পরবর্তীকালে 'খৃস্ট' সংকলন গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। টলস্টয় যাকে "elucidation of religious consciousness" বলেছিলেন তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ যে এই কবিতাগুলি রচনা করেন নি, এই কবিতাগুলির জন্ম যে ব্যাপক মানবতাবাদের উৎসমুখ থেকে একথা কবিতাগুলির আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য ও রচনার পরিবেশকাল থেকে সহজেই অনুমান করা যায়।

এই শতাব্দীর তিরিশের দশকের পৃথিবীতে যখন যুদ্ধের কালো চোখ ঘনীভূত হয়ে আসছে এবং যখন রবীন্দ্রনাথ দেখলেন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরাই এই মারণযজ্ঞের প্রধান পুরোহিতের পদ গ্রহণ করতে চলেছে তখন খ্রীষ্টানপন্থীদের ধর্মীয় আচার ও ব্যবহারিক আচরণের মধ্যে এই বিরোধ দেখে তাদেরই উপাস্য যীশুর চরিত ও বাণী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ সেই নৃশংস আচরণের নিন্দা

করেছেন এই কবিতাগুলির মাধ্যমে। ১৯৩২ সালে শান্তিনিকেতনে বড়োদিনের সভায় তিনি বলেছেন, "দেবালয়ে স্তবমন্ত্রে তাঁকে আজ যারা ঘোষণা করছে, তারাই কামানের গর্জনে তাঁকে অস্বীকার করছে, আকাশ থেকে মৃত্যু বর্ষণ করে তার বাণীকে অতি ভীষণ ব্যঙ্গ করছে।" আবিসিনিয়া ও স্পেন যখন ধর্ষিতা হতে চলেছে তখন রবীন্দ্রনাথ মানবপুত্র ও পরম মানব যীশুকে আহ্বান করেছেন, তাঁর ভক্তেরা তাঁকে যে পুনরায় ক্রুশকাঠে বিদ্ধ করতে চলেছে এই কথা পরম গভীর বেদনার সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন। একদিকে বিশ্বব্যাপী যমযজ্ঞ চলেছে, তার মধ্যে নতমুখ প্রপীড়িত মনুষ্যত্বের প্রতিনিধিকে যীশুকে, খ্রীষ্টানধর্মের নয়, মানবধর্মের সেই যীশুকেই রবীন্দ্রনাথ বন্দনা করেছেন। একথা আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে যদি আমরা লক্ষ্য করি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী জাপান যখন চীনদেশ আক্রমণ করে তখন রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গৌতম বুদ্ধও এমন যুদ্ধধ্বংসবিরোধী মানবতাবাদের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অজিতকুমার চক্রবর্তীর ব্রহ্মবিদ্যালয় গ্রন্থ থেকেও জানা যায় শান্তিনিকেতনে খ্রীষ্টমাসে খ্রীষ্টোৎসবের পর একে একে চৈতন্য কবীরের উৎসব পালিত হয় এবং এই উৎসব সমূহের উদ্দেশ্য ছিল সকল মহাপুরুষকেই জানার ও বোঝার সংকল্প জাগ্রত করা। সুতরাং খ্রীষ্টকে রবীন্দ্রনাথ খ্রীষ্টান ধর্মের অবতার হিসাবে নয়, পবিত্র ত্রিমূর্তির অন্যতম হিসাবে নয়, আদিম পাপের ভার থেকে উদ্ধারকর্তা হিসাবে নয়, মহামানব হিসাবে বন্দনা করেছিলেন। বিশ্বব্যাপী লুব্ধতা যখন মানুষে-মানুষে হিংস্রবুদ্ধির আগুন জ্বালিয়ে তুলছে তখন যে-মানুষ দুর্বলের বুকের উপর দিয়ে প্রবলের ইস্পাত-বাঁধানো বড়োরাস্তা পাকা করবার মন্ত্রণাদাতা হিসাবে আসেন নি—মানুষের সব চেয়ে বড়ো সম্পদ যে মুক্তি প্রাণপণ ব্রতে সেই মুক্তি দান করতে এসেছেন, এই যুগে মানবতাবাদের প্রধান পুরোহিত রবীন্দ্রনাথ সেই মানুষকে বন্দনা করেছেন, মৃত্যুবিষাক্ত আবহাওয়ায় জীবনের প্রদীপকে বাঁচিয়ে রাখার জরুরি প্রয়োজনে।

শুধু 'শিশুতীর্থ' কবিতাটি এই সময়ে খ্রীষ্টকাহিনী অবলম্বনে রচিত কবিতা-সমূহ থেকে স্বতন্ত্র। মানবতাবাদের আবেদন যে এই কবিতায় নেই তা নয়, কিন্তু এই কবিতায় এমন একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সুর আছে যা এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অন্য কোন কবিতায় পাই না। এই কবিতায় টলস্টয় কথিত সেই "religious essence of art" বিরাজমান যাকে তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন—"not an external inculcation of any religious truth in artistic guise, and not an allegorical representation of these truths, but the expression of a definite view of life…।"[১] এলিয়টের 'Journey of the Magi' কবিতার মতো 'শিশুতীর্থে'ও যীশুর কোন স্পষ্ট উল্লেখ নেই কিন্তু তবু প্রথমোক্ত কবিতার নামকরণের মধ্য দিয়ে বাইবেল ও যীশুর পরিবেষ্টন প্রথম মুহূর্ত থেকেই কবিতাটির পিছনে একটি পরিপ্রেক্ষিতের মতো কাজ করে। 'শিশুতীর্থে' "পূর্বদেশের বৃদ্ধের" উল্লেখে সামান্য ইঙ্গিত থাকলেও যীশুর স্পষ্ট উল্লেখ নেই। কিন্তু কবিতার শেষাংশে যখন আমরা বাইবেলের মাথু-কথিত সুসমাচারের দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শুনতে পাই তখন আর সন্দেহ থাকে না এই শিশুই যীশু।

…and to, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over them where the young child was.

When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy.

And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down, and worshipped him…

মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু,
উষার কোলে যেন শুকতারা।
দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্যরশ্মি শিশুর মাথায় এসে পড়ল।…
সকলে জানু পেতে বসল রাজা এবং ভিক্ষু, সাধু এবং পাপী,
জ্ঞানী এবং মূঢ়—
উচ্চস্বরে ঘোষণা করলে, জয় হোক মানুষের…।

সন্দেহ থাকে না খ্রীষ্ট-সংক্রান্ত অন্যান্য কবিতাগুলিতে মানবতাবাদের সংক্রাম একচ্ছত্র হলেও এই কবিতায় "religious essence of art" বিরাজমান, এক অধ্যাত্মবাদের পবিত্র প্রভা তার সর্বাঙ্গে জ্যোতি বিকিরণ করছে।

১। Shakespeare and the Drama—Tolstoy.

এই কবিতায় যীশুকে অবলম্বন করে মৃত্যুপরম্পরার মধ্য দিয়ে জন্মের ও নবজীবনের যে পৌনঃপুনিক আবির্ভাব তারই একটি মীথ গড়ে উঠেছে। এখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বের কোনো অপচ্ছায়াই পড়ে নি একথা মনে করলে ভুল করা হবে। যেন কবিতাটির পরোক্ষ বক্তব্য এই যে যীশু যেমন ক্রুশবিদ্ধ হবার পর পুনর্জন্ম লাভ করেছিলেন তেমনি বিধ্বংসী কামান নূতন সৃষ্টির আহ্বান ঘোষণা করছে। কিন্তু একটি ধর্ম-অনুপ্রাণিত প্রাচীন কাহিনী অবলম্বন করায় কবির বক্তব্য তাৎক্ষণিক পরিবেষ্টনের বিশেষ গণ্ডী থেকে মুক্ত হয়ে নির্বিশেষ কালের পক্ষে সত্য হয়ে উঠেছে, তার আবেদন হয়েছে সার্বভৌম। কিন্তু জন্ম ও মৃত্যুর সন্নিকট সম্পর্ক সম্বন্ধে যদি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বিশ্বাস পূর্বার্জিতরূপে না থাকত তবে খ্রীষ্টানধর্মের এই কাহিনীকে তিনি কাব্যরূপ দিতে পারতেন না, তার মধ্যে কল্পনার স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। গ্রীষ্মের দাবদাহের পর, আগ্নেয় উত্তাপের পর নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে বৃষ্টি পতনের ফলে নূতন প্রাণের আবির্ভাব তিনি পূর্বেই লক্ষ্য করেছিলেন এবং মহা-আশঙ্কাময় দুঃসময়ে যখন বিশ্বজগৎ নিঃশ্বাসবায়ু সংবরণ করে বিরলে প্রহর গণনা করছে তখন অকূল তিমির সন্তরি দূরদিগন্তে বঙ্কিম ক্ষীণ শশাঙ্ক দেখতে পেয়েছিলেন। যেমন খ্রীষ্টানধর্মেতিহাসের প্রাচীনতম কাল থেকে একটি হেরেটিকাল বিশ্বাসধারা চলে আসছে যে জুডাস খ্রীষ্টকে ধরিয়ে দিয়েছিল তিরিশটি রৌপ্যমুদ্রার লোভে নয়, খ্রীষ্টের মহত্তম এবং সত্যতম প্রকাশকে নিকটবর্তী করার জন্য, ক্রুশবিদ্ধ মৃত্যু খ্রীষ্টের মহত্ত্বের পক্ষে অনিবার্যরূপে প্রয়োজন ছিল ; তেমনি জীবনের পক্ষে, জীবনের শুচিতা বজায় রাখার পক্ষে মৃত্যুর অস্তিত্ব, আঘাতের অস্তিত্ব অনিবার্য না হলেও মাঝে মাঝে প্রয়োজন একথা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন। পূর্বার্জিত, উপনিষদের উত্তরাধিকার রূপে প্রাপ্ত, এই প্রত্যয় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল বলেই যীশুর জীবন ও খ্রীষ্টধর্মগ্রন্থ বাইবেলের কাহিনী অবলম্বনে এই মহৎ কবিতা তাঁর পক্ষে রচনা করা সম্ভবপর হয়েছে। ধর্মবিশ্বাস পোশাকের মতো নয় যে স্বেচ্ছায় প্রয়োজনমতো তাকে গ্রহণ বর্জন করা যায়। খ্রীষ্টধর্মের প্রধান পুরুষকে অবলম্বন করে মানবতাবাদী কবিতা রচনা সহজ, তার আবেদনও অগভীর, কিন্তু তার আধ্যাত্মিক বিশ্বাস নিয়ে কবিতা রচনা সম্ভব নয়, যদি অনুরূপ বিশ্বাসের কেন্দ্র পূর্বপুরুষের রক্ত থেকে বা স্বকীয় উপলব্ধি থেকে কবি ইতিপূর্বে অর্জন না করে থাকেন।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ প্রশ্ন থেকে যায় যে মৃত্যুর গর্ভ থেকে জীবনের আবির্ভাব সম্বন্ধে এতদিন কবিতা লেখার পর সহসা রবীন্দ্রনাথ কেন যীশুজীবনকাহিনী অবলম্বনে তাকে নূতন করে প্রকাশের তাড়না অনুভব করলেন। প্রথমত, সমসাময়িককালের যীশু-বিষয়ে বিভিন্ন কবিতা রচনা করায় যীশুর ভাবমূর্তি তাঁর সামনে এই সময় বিশেষভাবে উপস্থিত ছিল বলে মনে হয়। দ্বিতীয় ও প্রধান কারণ, এলিয়টের 'Journey of the Magi' কবিতার প্রভাব। 'পুনশ্চে'র তারিখ অনুযায়ী 'শিশুতীর্থ' লিখিত হয় শ্রাবণ ১৩৩৮-এ, 'তীর্থযাত্রী' অনুবাদ কবিতা রচিত হয় ১৩৩৯ সনে। কিন্তু 'শিশুতীর্থ' কবিতাটি 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে 'তীর্থযাত্রী'র পরে স্থান পেয়েছে বলে এবং 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের 'আধুনিক কাব্য' (১৩৩৯) প্রবন্ধে এলিয়টের পুনঃপুনঃ উল্লেখ ও তাঁর কবিতাসমূহের বিক্ষিপ্ত ছত্রের কবিকৃত অনুবাদ থেকে মনে হয় 'তীর্থযাত্রী' অনুবাদ কবিতা যদি তিনি পরেও লিখে থাকেন, তবুও 'Journey of the Magi' কবিতাটি তাঁর নিশ্চিতরূপেই 'শিশুতীর্থ' রচনার আগে পড়া ছিল। 'পুনশ্চে' সাহসের সঙ্গে গদ্যছন্দের ব্যবহার, ইমেজের ও শব্দনির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক জীবনের গদ্যময়তার দিকে ঝোঁক প্রভৃতি তৎকালে আধুনিক কবিতার যেগুলি মৌলিক লক্ষণ মনে করা হত সেগুলিকে নিজের কাব্যের অঙ্গীভূত করে নেবার বিশেষ আগ্রহ এই সময়ে রবীন্দ্রনাথে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। এই সব ব্যাপারে এলিয়টের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কবিতার কাব্যকৃতির দিকে কী পরিমাণ পড়েছিল তা পৃথক প্রবন্ধে আলোচনার বিষয়। কিন্তু অন্য প্রমাণ ব্যতিরেকেও নিতান্ত আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যেই নিশ্চিতরূপে বলা যায় 'শিশুতীর্থ' 'Journey of the Magi'-এর প্রভাবে রচিত। সুতরাং 'শিশুতীর্থের' যে কেন্দ্রীয় কাব্যবিষয় জীবন-মৃত্যুর ঘনিষ্ঠতা তাতে যদিও রবীন্দ্রনাথের পূর্ব থেকে বিশ্বাস ছিল তবুও সেই বিশ্বাসের এই নবতর রূপায়ণে এলিয়টের কবিতা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথ নিজের কবিতার নাম দিয়েছেন 'শিশুতীর্থ', এলিয়টের অনুবাদের নাম দিয়েছেন 'তীর্থযাত্রী'। দুটি কবিতাতেই আধ্যাত্মিক সার্থকতার তীর্থে নানা ব্যাঘাত-বিঘ্নকে অতিক্রম করে পৌছনর কথা বলা হয়েছে। দুটি কবিতাই যাত্রার বিবরণ—রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বর্ণনাকারী দ্রষ্টামাত্র, এলিয়টের কবিতায় বর্ণনাকারী অন্যতম যাত্রী, অন্যতম

Magus, ভূয়োদর্শী বৃদ্ধ ; রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যাত্রার তাৎক্ষণিক বিবরণ, এলিয়টের কবিতায় যাত্রী—শিশুকে দেখে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর স্মৃতি রোমন্থন করছে। দুটি কবিতারই কেন্দ্রীয় কাহিনী বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্টের ম্যাথুর দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে গৃহীত। এলিয়টের পূর্বদেশীয় বৃদ্ধ যাত্রা আরম্ভ করেছিল "the very dead of winter"-এ শীতের বন্ধ্যাত্বে, রবীন্দ্রনাথের যাত্রীরাও মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো অন্ধকারে যাত্রা শুরু করেছে। একদিকে "cursing and grumbling" অন্যদিকে "পরশ্রীকাতরের কানাকানি, কুৎসিত জনশ্রুতি, অবজ্ঞার কর্কশ-হাস্য" ; একদিকে "liquor and women" অন্যদিকে "কোন কামিনী যৌবনমদবিলসিত নগ্নদেহে অট্টহাস্য করে।" একদল পথিক পার হয়ে গেল "temperate valley, wet, below the snow line, smelling of vegetation" অন্য দল পথিক পার হয়ে গেল "তিব্বতের হিমকম্পিত অধিত্যকা", "লতাজালজটিল অরণ্য।" 'শিশুতীর্থ' কবিতায় হত্যাকারী যে অধিনায়ককে হত্যা করেছে সেই অধিনায়ক পূর্বদেশীয় বৃদ্ধ নয়, সেই নেতা স্বয়ং খ্রীষ্ট এবং সেই মিছিল শেষ পর্যন্ত পশুশালার দ্বারপ্রান্তে পৌছে যে শিশুকে আবিষ্কার করেছে সেই শিশুও খ্রীষ্ট—মৃত্যুর মধ্য দিয়েই সে মহৎ পুনর্জন্ম লাভ করেছে। সেই অবিনশ্বর জন্মের দৃশ্য দেখার পূর্ব পর্যন্ত স্মৃতি-রোমন্থনকারী এলিয়টের বৃদ্ধও মনে করত জীবন ও মৃত্যু বুঝি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আজ সে প্রগাঢ় অভিজ্ঞতার আলোকে জানে মৃত্যু ও জন্ম অবিচ্ছেদ্য—যীশুর জন্ম ও মহৎ কাহিনী জানা মানেই ভক্তের পুরনো অভ্যস্ত জীবনের চিরকালীন মৃত্যু। অথচ অসহ্য পৌত্তলিক পরিবেশে ফিরে এসে সে আবার নূতন করে এই অভ্যস্ত ক্লেদাক্ত জীবনের মৃত্যু চায়, কেননা আজ সে জানে মৃত্যুকে অস্বীকার করলে মহৎ জীবন লাভও অসম্ভব। অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে দুটি কবিতায় একটা বড় রকমের পার্থক্য চোখে পড়ে, 'শিশুতীর্থে' হত্যার স্পষ্ট উল্লেখ, 'Journey of the Magi'-তে তার অনুল্লেখ। কিন্তু এলিয়টের কাব্যের অন্যতম প্রধান আলোচক হেলেন গার্ডনার দেখিয়েছেন যে ঐ কবিতার সমস্ত ইমেজই কীভাবে ক্যালভারির সেই বিষণ্ণ দৃশ্যের দিকে ইঙ্গিত করছে, "The three Trees on the low sky are portents of the trees to be lifted upon the hill outside the city wall of Jerusalem, and the six hands dicing for pieces of silver foretell both the dicing at the foot of the cross and the price

of innocent blood."[১] এলিয়টের কবিতার শেষে "I should be glad of another death" কেননা সেই মৃত্যুই নবজীবনকে জয় করতে পারে, অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সকলে "কণ্ঠ মিলিয়ে গান করলে,—জয় মৃত্যুঞ্জয়ের জয়।" রবীন্দ্রনাথ নিজের খ্রীষ্টের সম্বন্ধে অন্যত্র বলেছেন, "যে মহাপুরুষ তাঁর জীবনের মধ্যেই অমৃতলোকের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর দ্বারা অমৃতরূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, আজ তাঁর মৃত্যুর অন্তর্নিহিত সেই পরম সত্যটিকে যেন আমরা স্পষ্ট আকারে দেখতে পাই।" (খৃষ্টোৎসব, খৃষ্ট)।

এইভাবে পাশাপাশি রেখে বিচার করলে একদিক থেকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থ' এলিয়টের কবিতাটিরই সম্প্রসারিত ব্যাখ্যা, যেমন আনুপূর্বিক সমালোচকেরা দেখিয়েছেন যে এলিয়টের কবিতাটি ছিল অনেকাংশে শ্রদ্ধাস্পদ বিশপ ল্যান্‌সলট্ অ্যাণ্ড্রুজের একটি সার্মনের সম্প্রসারণ[২]। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীতে কখনো-কখনো যে অতি-ভাষণ প্রবণতা থাকে সে কথা স্মরণে রাখলে এই উক্তি আরো সঙ্গত বলে মনে হবে। কিন্তু সঙ্গত মনে হলেও একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়—একজন জন্মের মধ্যে ভবিষ্যৎ মৃত্যুকে প্রতিবিম্বিত দেখেছেন, অপরজন প্রতিফলিত দেখেছেন মৃত্যুর মধ্যে নবজন্মকে। রবীন্দ্রনাথের কাছে মৃত্যু মহত্ত্বদানের উপায়মাত্র, জীবনই মূলতম সত্য, এই নিঃসংশয় আশাবাদীর কাছে পাপ পুণ্যমন্দিরের সোপানমাত্র—অপরপক্ষে এলিয়টের কাছে খ্রীষ্টানের আদিপাপচেতনায় পতন ও শুদ্ধির প্রগাঢ় উপস্থিতির ফলে মৃত্যু অপ্রধান নয়, সে জীবনের সমকক্ষ সত্তা,—মৃত্যু ও পাপের স্পর্শ ব্যতিরেকে জীবন ও শুভতা তাৎপর্যহীন। কবিচিত্তের এই পার্থক্য মৌলিক এবং এই মৌলিক পার্থক্য কবিতাদুটিতেও প্রতিবিম্বিত। কিন্তু এই মৌলিক পার্থক্যের বৃত্তের মধ্যেও লক্ষ্য করি, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় জীবনের যে ভরসা স্বীকৃত, 'Journey of the Magi'-তে তার নিশ্চিত প্রকাশ নেই বটে কিন্তু পূর্বদেশীয় বৃদ্ধের মধ্যে যে নূতন করে মৃত্যুবরণের কামনা দেখা দিয়েছে তাই

১। The Art of T. S. Eliot (Chap. V)—Helen Gardner.

২। It was no summer progress. A cold coming they had of it at this time of the year, just the worst time of the year to take a journey and specially a long journey in. The ways deep, the weather sharp, the days short, the sun farthest off in solstitio brumali, "the very dead of winter."

পরবর্তীকালে 'Murder in the Cathedral' কাব্যনাট্যে টমাস বেকেটের আত্মদানের মধ্যে স্পষ্ট স্বীকৃতি পেয়েছে। সুতরাং 'শিশুতীর্থে'র মতো নিরঙ্কুশ আশাবাদী না হলেও এলিয়টের কবিতাটি সম্পূর্ণ অন্ধকারে বদ্ধমূল নয়, সে আলোর দিকে উঠছে—দেহের ও ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতা অতিক্রম করে পরিত্রাণের পথ কোন্‌দিকে তার ইশারা তার মধ্যে মেলে।

দুই

'শিশুতীর্থে' একদল যাত্রী এক কেন্দ্র থেকে অন্য লক্ষ্যাভিমুখে যাত্রা করেছে। এই যাত্রাকাব্যটির সম্পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করতে গেলে এই কবিতাটির পাশে রবীন্দ্রনাথের অপর বিখ্যাত যাত্রাকাব্য 'সোনার তরী'র 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' রেখে আলোচনা করা প্রয়োজন বলে আমার মনে হয়। দুটি কবিতার রচনাকালের মধ্যে দীর্ঘকালের ব্যবধান। এই দীর্ঘ ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের প্রথমেই যে প্রত্যয়গুলি বীজাকারে বর্তমান ছিল তা সুস্পষ্ট পরিণতি লাভ করেছে, ফলে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় যে প্রবণতা উচ্ছ্বসিত আগ্রহে আত্মপ্রকাশ করেছে তা অস্বীকৃত হয়ে স্বতন্ত্র প্রবণতায় রবীন্দ্রনাথ 'শিশুতীর্থে' জীবনের পরিণামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র মধ্যে দূরাভিসারী রোম্যান্টিক কল্পনা সম্পূর্ণ শুদ্ধতায় বিরাজমান। এবং এই দূরাভিসারী রোম্যান্টিক কল্পনার সাধারণ যে মৌলিক চরিত্র তা এই কবিতাটিতে একত্র বিরাজমান, এক রহস্যময়ী রমণী এই যাত্রায় সহযাত্রী, এবং এই যাত্রার কোন লক্ষ্য নেই, যদি না কল্পনার স্বর্গকে লক্ষ্য বলে স্বীকার করি। আদি-উষা থেকে মানুষের চিত্তলোকে প্রতিষ্ঠিত এই রমণী সে যাত্রার সঙ্গিনী হোক অথবা কল্পনা-স্বর্গের অধিবাসিনী হোক, সে সর্বদাই রহস্যময়ী, উর্বশী-প্রতিমা, সমাজ-সংসারের নীতি-নিয়মের বহির্দিগন্তে বিরাজমানা, "নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ" এবং সেই স্বর্গ এমন এক দিব্য আলোয় রচিত যার অবস্থান সমুদ্রে বা বসুধায় কোনো দিন ছিল না। কল্পনা-রঙ্গময়ীকে সঙ্গে নিয়ে অথবা কল্পনা-রঙ্গময়ীর অনুসন্ধানে কল্পলোকে এই যে নিরুদ্দেশ যাত্রা সেই যাত্রায় সমাজ-সংসার মিছে হয়ে যায়; তার আহ্বান, দূরাগত কলরব সেই স্বপ্ন-তাড়িত পথিকের কানে প্রবেশ করতে পারে না। সেই রঙ্গময়ী-সঙ্গিনী "বিদেশিনী" এবং "অপরিচিতা", সুতরাং সংসারের দৈনন্দিন নীতি-নিয়ম এই রহস্যময়ীকে স্পর্শ

করে না; তার দেহসৌরভ, বায়ুভরে গায়ে-উড়ে-পড়া কেশের রাশি কবির দেহকে বিবশ, হৃদয়কে সম্পূর্ণ বিকল করে—এবং "জগৎ প্লাবিয়া অসীম রোদনের" মতো তীরহীন যে সমুদ্র তাকে এই উধাও তরণী উপেক্ষায় অতিক্রমণ করে যায়। কোনো কথা না বলে, রহস্যমধুর হাসি হেসে, এই রমণী যে স্বর্গে কবিকে নিয়ে যায় সেই স্বর্গও কল্পনার দ্যুতির রচনামাত্র, "চঞ্চল আলো আশার মতন" কাঁপছে বটে কিন্তু সেই "আশার স্বপন" বা "সোনার ফল" পরিচিত পৃথিবীর আয়ত্তের মুঠোয় আসে না। কবিতার শেষাংশে শুদ্ধ রোম্যান্টিক কল্পনার এই পক্ষপ্রসার যে শেষ পর্যন্ত বৃথা, যে স্বর্গে রহস্যময়ী নিয়ে চলেছিল সে যে ভুল স্বর্গ তার ইঙ্গিত রয়েছে, কেননা "সন্ধ্যা-আকাশে" কল্পনার সেই "স্বর্ণ-আলোক" ঢাকা পড়ে যাবে এবং সময় আসবে যখন "দেখিতে পাব না নীরব হাসি"। শুধু সুন্দর বা কল্পনা যে যথেষ্ট নয়, শুভতা-বিচ্ছিন্ন সুন্দর এবং জগৎ-বিচ্ছিন্ন কল্পনা যে বৈকল্যের পথে নিয়ে যায়, এই কথা রবীন্দ্রনাথে বারংবার নানাভাবে উচ্চারিত হয়েছে, 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র পরিণামে কল্পনার উধ্বগামী যাত্রার মধ্যেও সেই সত্যকে পুনর্বার কবি উপলব্ধি করেছেন। তাই দ্বিতীয়বার যখন তিনি রূপকযাত্রায় অগ্রসর হলেন তখন পথনির্দেশিকা সিন্ধুপারের রহস্যময়ী বিদেশিনী নয়, তখন পথপরিচালক পূর্বদেশীয় এক বিজ্ঞ বৃদ্ধ।

অথচ কর্মের কোলাহল, কর্তব্যের যন্ত্রণাকে ভুলে আটলান্টিস বা এল্ ডোরাডো বা সুবর্ণদ্বীপে পরমাসুন্দরী প্রণয়িণীকে সঙ্গে নিয়ে বাসের বাসনা বারবার মানুষের কল্পনাকে উত্তেজিত করেছে। এই আকাঙ্ক্ষার মূল বোধ হয় আদিম মানুষের আদিতম সংস্কারের কোনো অন্ধকারে নিহিত। সেই আহ্বান বারংবার পথিককে ভোলায়। তাই যজ্ঞাশ্ব নিয়ে অর্জুন প্রমীলারাজ্যে এসে উপস্থিত হয়, তাই ওদিসিয়ুস পলভুক্‌দের দেশে এসে পৌছয় এবং সেই মদগন্ধী কমলের স্বাদ ইথাকার সমস্ত স্মৃতি, কর্তব্য ভুলিয়ে দেয়। এসে পৌছয় উদয়দ্বীপে যেখানে যাদুবিদ্যাপারঙ্গমা দেবী সার্স বিরাজমানা। অতঃপর ওদিসিয়ুস এসেছিল থেটিস-কন্যা ক্যালিপ্‌সোর দেশে। কৃষ্ণকায় পপলার ও সাইপ্রেস গাছ ক্যালিপ্‌সোর গুহার চারিদিক বেষ্টন করে দণ্ডায়মান, প্রবেশদ্বারে আন্দোলিত আঙুরলতা, স্বচ্ছ নদীর জলে উর্বর নিকটবর্তী মাঠ ইরিস প্রভৃতি পুষ্পে পরিপূর্ণ; এখানে এসে ক্লান্ত ওদিসিয়ুস প্রচুর খাদ্য, উত্তেজক পানীয় এবং ক্যালিপসোর শয্যার অংশ

পেয়েছিল, উপরন্তু প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল অমর জীবন ও অনবমিত যৌবনের। কিন্তু দেবী সার্স-এর মতো ক্যালিপ্‌সোকেও প্রত্যাখ্যাত হতে হয়েছিল। স্বরূপা চিত্রাঙ্গদার বাহুবেষ্টনে নারীর ললিত লোভন লীলায় ক্লান্ত অর্জুনের মতো, এই গ্রীকবীরও শেষে ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল, ইথাকার দিকে তাকিয়ে সে সমুদ্রতটে বসে থাকত এবং দীর্ঘশ্বাস মোচন করত। মঙ্গলকর্ম ও কর্তব্যের দাবি, প্রকৃত পুরুষের দায়িত্ববোধ শেষ পর্যন্ত ওদিসিয়ুস বিস্মৃত হতে পারে নি।

হিপোলিটাস নাটকে ইউরিপিদেস্‌-এর রচনায় নিরুদ্দেশ যাত্রার দুরন্ত আকর্ষণের অনুরূপ প্রকাশ পাই।

To the strands of the Daughters of the sunset,
The apple tree, the singing and the gold ;
Where the mariner must stay him from the onset
And the red wave is tranquil as of old ;
Yea beyond that Pillar of the End
That Atlas guardeth, would I wend.

যে কারণে কচ দেবযানীকে ত্যাগ করে গিয়েছিল প্রত্যাখ্যাতার সুতীব্র অভিশাপের বোঝা বহন করে সেই কারণে ভার্জিলের নায়ককেও দিদোর আলিঙ্গন থেকে তেমনি বিদায় নিতে হয়েছিল। দিদোর প্রশ্নের উত্তরে নায়কের মুখ দিয়ে ভার্জিল বলিয়েছেন "often as night's dewy shades invest the earth and the fiery stars arise, the troubled phantom of my father Anchises admonishes me in slumber, apalling me",—সুতরাং পিতার ছায়ার মধ্যে প্রতিমূর্ত কর্তব্যের যে আহ্বান তাকে অ্যানিস উপেক্ষা করতে পারে নি, রোমনগরী প্রতিষ্ঠার মহৎ দায়িত্ব পালনের জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই মদমধুর জীবন তাকে ত্যাগ করতে হয়েছে।

কিন্তু মোহমুগ্ধ মানুষের সামনে সেই কল্পস্বর্গের আকর্ষণ এত বেশি যে কর্তব্য, শুভ ও নিয়মের কর্কশ বার্তা তাকে অনেক সময় সেই সম্মোহন থেকে মুক্ত করতে পারে না। হোমারের ওদিসিয়ুস অনিচ্ছায় ভ্রমণে বেরিয়েছিল এবং সেই ভ্রমণে বিচিত্র মনোহরণের আয়োজন সত্ত্বেও ইথাকার কথা সে ভুলতে পারে নি। হোমারের এই নায়কের সঙ্গে দান্তের নরকের অষ্টম বৃত্তে আমাদের আবার সাক্ষাৎ হয়। দু-হাজার বছর পরে এসে দেখি সেই

...কের অভূতপূর্ব পরিবর্তন—প্রজ্ঞা এবং সার্থকতার ক্রমবিলীয়মান দিগন্তের ...াবনে সে আজ অন্য সবই ভুলে যেতে প্রস্তুত।

No tenderness for my son, nor piety
To my old father, nor the wedded love
That should have comforted Penelope
Could conquer in me the restless itch to rove
And rummage through the world exploring it,
All human worth and wickedness to prove.

...ই ইউলিসিস তার শরিকবৃন্দ নিয়ে শেষবারের মতো সূর্যাস্তের পরপারে ...বসতিহীন জগতের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছিল। অযৌক্তিক তাড়নায় ...াড়িত এই ইউলিসিসই পরবর্তীকালে ভিক্টোরীয় যুগের রাজকবি টেনিসনের ...াতে পড়ে যুক্তিবাদী হয়ে উঠেছে এবং নিজের উন্মাদ আগ্রহের তীব্রতা ...তটা তা বোঝাতে গিয়ে নিতান্ত অসঙ্গত ও অশোভনভাবে বলেছে পেনিলোপি এখন বৃদ্ধা এবং ইথাকা দ্বীপের বর্বর প্রজারা তার মর্ম বোঝে না। ...ই বৃদ্ধের এখন বাড়িতে মন বসে না বলেই যেন তার ভ্রমণ ...াসনা।

শুদ্ধ রোম্যান্টিকবৃত্তির প্রেরণায় কবিকল্পনা যখন নাবিক হয়ে এমন দেশদেশান্তর অতিক্রম করে ভ্রমণে বহির্গত হয় তখন কখনো মার্কিনকবি হুইটম্যানের মতো ভারতবর্ষের অভিমুখে অথবা ইংরেজকবি ইয়েটস-এর মতো প্রাচীন বাইজানটিয়ামের দিকে সে নৌকার মুখ ফেরায়। হুইটম্যানের 'প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' কবিতায় ভারতবর্ষ সুদূর স্বর্গের আলোর মতো এক দিব্যবিভায় আলোকিত হয়ে ওঠে এবং সেই বিভায় উদ্‌ভ্রান্ত নাবিক আত্মাকে সঙ্গী করে যাত্রা করে।

Sail forth—steer for the deep waters only,
Reckless O Soul, exploring, I with thee, and
thee with me.
For we are bound where mariner has not yet
dared to go
And will risk the ship, ourselves and all.

অপরপক্ষে ইয়েটস্‌ "mackarel-crowded" "that dolphin-torn, that

gongtormented" সমুদ্রপারে বিরাজমান সেই বাইজানটিয়ামের উদ্দেশে তাঁর তরণী ভাসিয়েছেন যে দেশ বৃদ্ধদের জন্য নয়, আলিঙ্গনে আবদ্ধ যুবক-যুবতীদের জন্য বিধি-নির্দিষ্ট ; যেখানে স্বাস্থ্যকল্প মোজেইকের প্যাটার্নের মধ্যে জীবনের স্পন্দন অনুভূত হয়, যেখানে সম্রাট-সভার স্বর্ণশাখায় সোনার শাশ্বত পাখি কালপ্রবাহের গান গায়।

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে এই উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা যতই সেই মাতাল তরণীকে ভাসিয়ে নিয়ে যাক তার মধ্যে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি কবিসম্প্রদায় লাভ করতে পারেন নি। হোমার না, ভার্জিলও না। মহাভারতের অন্তিমে যে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা সে-যাত্রা ভোগে আরক্তিম নয়, সেই যাত্রা ত্যাগের সোপান-পরম্পরায় উর্ধ্বগামী। কামোয়্যার মহাকাব্যেও ভারতবর্ষের পথে যাত্রী ভাস্কো দা গামা এবং তার অনুযাত্রী নাবিকগণ প্রেমের দ্বীপে পরীদের সাহচর্যে-সঙ্গমে কালাতিপাত করেছে বটে কিন্তু তারা কর্তব্য বিস্মৃত হয় নি। জেরুজালেম উদ্ধার কাব্যের ষোড়শ সর্গে আর্মিদা রিনাল্দোকে তার রথে চড়িয়ে সমুদ্রের পরপারে পাহাড়ের উপরে বরফসীমার উর্ধ্বে চিরস্থায়ী বসন্তলোকে অবস্থিত প্রাসাদে নিয়ে গেছে বটে কিন্তু সাময়িক স্বপ্নমদির নেশায় মেশা এই উন্মত্ততা জেরুজালেম উদ্ধারের পরম ব্রতকে ব্যাহত করতে পারে নি। শুধু সুন্দর নয়, শুধু কল্পলোকে সংসারের গুরুভার থেকে অব্যাহতি নয়, কর্তব্য ও মঙ্গলকর্ম বারংবার বড় বলে মনে হয়েছে। তাছাড়া কল্পলোক যেহেতু অনায়ত্ত, প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতায় যেহেতু তার আবির্ভাব অসম্ভব, নাইটিঙ্গেলের সুরের ডানায় যুগ-যুগ ভ্রমণ করে এলেও যেহেতু করুণস্বরে "বিদায় বিদায়" বলে ধুলিতে-ধূসরে প্রত্যাবর্তন করতে হয়, জিজ্ঞাসা করতে হয় আমি কি জাগ্রত অথবা নিদ্রিত—ঠিক সেই কারণেই স্বপ্নলোকে কুসুমের কারাগারে চিরকাল আবদ্ধ থাকা চলে না। রোম্যান্টিক কল্পনা তাই স্থান থেকে স্থানান্তরে মনোরথে আমাদের নিয়ে যায় বটে, কিন্তু সেই স্বপ্নপ্রয়াণ থেকে যখন বাস্তব পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করতে হয় তখন সেই দূরাভিসারের অভিজ্ঞতা জীবনের জটিল জট ছাড়ানোয় কিঞ্চিৎ সাহায্য করতে পারে না। এই কথা বোদলেয়ারও Le Voyage কবিতায় উপলব্ধি করেছিলেন—

> The drunken sailors' visionary lands
> Can only leave the bitter truth more stark.

কল্পনার পাখা যে সৌন্দর্যলোকে পুনঃপুনঃ আমাদের অভিযাত্রী করায় সেই যাত্রা থেকে অসুন্দর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন যেহেতু নিরতিশয় পীড়াকর, তাই হোমার থেকে যে-যাত্রা শুরু হয়েছিল বোদলেয়ারের কবিতায় বিশুদ্ধ রোম্যান্টিক স্বপ্নপ্রয়াণের সেই চিত্র এত বিষাক্ত, এত কটু এবং কর্কশ। রোম্যান্টিক ভ্রমণকামের মদ সবটুকু পান করা হয়ে গেছে, এখন শুধু পড়ে থাকে পাত্রের নিচে বিস্বাদ তলানিটুকু, তাই বোদলেয়ার এই যাত্রাপথেও আবিষ্কার করেছেন "the weary pageant of Immortal sin"।

'L' Invitation on Voyage' কবিতায় ওলন্দাজ বন্দরের স্তিমিত খালের জলে অপেক্ষারত ঘুমন্ত এবং যাত্রার স্বপ্নে মগ্ন জাহাজগুলির দিকে তাকিয়ে কবি সঙ্গিনীকে আমন্ত্রণ করেছেন সেই দেশে যাত্রার জন্য যে-দেশে জলমগ্ন সূর্য বিপর্যস্ত মেঘের অন্তরাল থেকে বিভা ছড়ায়, যে-দেশের গৃহাভ্যন্তরে প্রাচীন আসবাব, অদৃষ্টিগোচর ফল ও সুগন্ধির সমাবেশ এবং যেখানে—

> There, there is nothing else but grace and measure,
> Richness, quietness and pleasure.

কিন্তু এ তো যাত্রা-প্রাক্কালের আনন্দিত কল্পনা! এরপর যাত্রা শুরু হল। Un Voyage a' CyThe're কবিতায় যে দ্বীপ চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সেই কৃষ্ণকায় দ্বীপ শবাচ্ছাদক বস্ত্রের মতো বিষণ্ণ ; ধূপের সুগন্ধি নেই, কামপরিতৃপ্তির পরিণামের আলস্য নেই, "it was a waste where nothing grows"। কাকের কর্কশ চিৎকারে মুখর, ফাঁসিকাঠে শোভিত, পচনশীল আন্দোলিত শবে পরিপূর্ণ সেই দ্বীপে দাঁড়িয়ে কবির অন্তিম প্রার্থনা—

> O God, give the strength to scrutinise,
> Without disgust, my body and my heart !

'Le Voyage' কবিতায় কবি বলেছেন যে-মানুষের "hearts like balloons unballasted" একমাত্র সেই আদর্শ ভ্রমণকারী হতে পারে। কিন্তু যেহেতু পূর্বস্মৃতি এবং দায়িত্বের কর্তব্য থেকে কোনো মানুষই মুক্ত নয় সেই কারণে শুদ্ধ রোম্যান্টিক কল্পনার সেই আদর্শ ভ্রমণকারী হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয় কোনোদিন। এই নাবিকগণ বেগুনী সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখেছে, ঐশ্বর্যগর্বিত নগরী এবং তাম্বুলে-রক্তিম ওষ্ঠাধরধারিণী রমণীদের দেখেছে, অপর দিকে দেখেছে "Men, greedy, lustful, ruthless in cupidity"।

তখন মনে হয়, "Baudelaire's traveller knows that he can never satisfy his desire, never escape himself, or the pursuing feet of time. Dante's Ulysses found Purgatory; Baudelaire finds Hell."[১] কিন্তু তারপরই এতদিন অনুপস্থিত এক অতিক্রমণের, উত্তরণের ইঙ্গিত আমরা শুনতে পেলাম—হে মৃত্যু, হে বৃদ্ধ অধিনায়ক, নোঙর তোল, নিয়ে চল আমাদের বিপর্যস্ত দিনগুলির পরপারে এবং "pour us your poison to revive our soul"—তোমার মৃত্যুর গরল ঢেলে আমাদের আত্মাকে তুমি উদ্ধার কর। যে-মুহূর্তে নরকের অন্ধকারে দান্তে উপলব্ধি করেছিলেন যে তিনি পথ হারিয়ে ফেলেছেন সেই মুহূর্তে পাহাড়ের উপর উষালোকের সামান্য আভাস তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। রূপকের অর্থটি অত্যন্ত স্পষ্ট—যে-মুহূর্তে বোঝা যায় হারিয়ে গেছি, সেই মুহূর্তেই নিজেকে খুঁজে পাওয়ার সূত্রপাত, অন্ধকারের উপলব্ধিই আলোকের আবির্ভাবের পথপ্রদর্শক। মৃত্যু-গরলের বিস্বাদেই আত্মার পুনরুদ্ধার নিহিত।

এবং প্রপীড়িত আত্মার নবজাগরণের জন্য তার কল্পনার ভূগোলে বিশ্বভ্রমণ প্রয়োজন হয় না, পাপ-অনুতাপ-পরিত্রাণের এই যে রূপক-যাত্রা সে-যাত্রা অন্তরের গোপন-লোকে রূপায়িত হয়। প্রাগুক্ত কবিতাতেই বোদলেয়ার অনুরূপ উপলব্ধির বশে বলেছেন—"The winningpost is nowhere, yet all round"। অথচ 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' থেকে আরম্ভ করে বিশুদ্ধ রোম্যান্টিক যাত্রার অন্যান্য কবিতাগুলিতে এই আত্মার ক্রমোন্নতি পাই না, আভ্যন্তরীণ মৃত্যু ও পাপের সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে তার শুদ্ধতা অর্জনের ইতিহাস পাই না। সেখানে যাত্রীরা যখন নিজের বন্দরে ফিরে এসেছে তখন কোনো শুদ্ধতর আত্মা নিয়ে তারা প্রত্যাবর্তন করে নি, বরং কল্পনার রঙীন বিভ্রম এখনো চোখে লেগে থাকায় নিকট প্রতিবেশ তাদের কাছে পীড়াকর বলে মনে হয়েছে। কিন্তু বোদলেয়ারের যাত্রাকাব্যের শেষে এমন এক ইঙ্গিত পেলাম যে-ইঙ্গিত আত্মার উদ্ধারের পথে আমাদের নির্দেশ করে। নিরুদ্দেশ যাত্রার স্বপ্নগ্রস্ত পথিকেরা নাইটিঙ্গেলের সঙ্গীতে মুগ্ধ কবির মতো যখন ফিরে আসে তখন তারা শুদ্ধতর আত্মার অধিকারী হয়ে ফিরে আসে নি তার কারণ তাদের

১। The Decline and Fall of the Romantic Ideal—Lucas.

অভিজ্ঞতা তাদের পুনর্জন্ম দেয় নি। যন্ত্রণাই জন্ম দেয়, তাদের অভিজ্ঞতা যেহেতু ছিল আনন্দদায়ক সেই কারণে তার মধ্যে পুনর্জন্মের বীজ নিহিত ছিল না। বাইবেলের খ্রীষ্টের নির্দেশবাণী তারা শোনে নি—"Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up the cross, and follow me"। ভোগৈশ্বর্য, স্বার্থ ত্যাগ করে এই নিরুদ্দেশ যাত্রার পথিকেরা যাত্রা করে নি, যন্ত্রণার ক্রুশকাঠ তাদের বহন করতে হয় নি, তাই তাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের মৌলিক রূপান্তরের কোনো পরিচয় পাই না। 'শিশু-তীর্থে'র যাত্রীদের সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। পাপ বা মৃত্যুর সংস্পর্শের যে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে পুনর্জন্ম দান করেছে; সেই পুনর্জন্ম তাদের আত্মার মৌলিক রূপান্তর ঘটিয়েছে বলেই তারা যখন ফিরে এল তখন তারা সেই পূর্বের মানুষ নেই। তাদের অভিজ্ঞতা তাদের প্রতীকী ক্যালভারিতে নিয়ে গিয়েছিল বলেই তাদের পুনর্জীবন অর্জন সম্ভবপর হয়েছে। একদলের যাত্রা যদি প্রমোদভ্রমণ, অন্যদলের যাত্রা তবে তীর্থভ্রমণ।

শ্রীযুক্তা বডকিন যাকে Rebirth Archetype বলেছেন, যাকে আমি তীর্থযাত্রার কাব্য বলছি, তার মধ্যে সেই Rebirth Archetype বিরাজমান। এবং দান্তের 'দিব্যমিলন' কাব্যই এই ধরনের কাব্যের প্রধানতম নিদর্শন। পাপ, শুদ্ধি এবং উদ্ধার, এই তিনটি স্তর অবলম্বন করে তিনি তাঁর মহাকাব্যের তিনটি স্বতন্ত্র খণ্ড রচনা করেছেন। বোদলেয়ার যেমন নরকের মধ্যে বাস করেও গরলের মধ্যেই অমৃতের আস্বাদ পেয়েছেন, তেমনি দান্তের নরকের ক্লেদপুরীষবমনের মধ্যে আমরা নবজীবনের ইঙ্গিত পাই। তৃষ্ণা এবং শুষ্ক মরু, সবই তো মৃত্যুর প্রতীক; দান্তের তৃষ্ণার্ত নরকবাসী আজ অতীতে ফেলে-আসা পাহাড় থেকে লাফিয়ে-পড়া শীতল জলবতী নদীসমূহের স্বপ্ন দেখে, যেমন এলিয়ট তাঁর "here is no water but only rock" বন্ধ্যাভূমিতে জলের স্বপ্নের মধ্যে মুক্তির ও উদ্ধারের প্রত্যাদেশ পেয়েছেন। তাঁর কাব্যে জল-পতনের শব্দবিন্দুগুলি "drip drop drip drop drop drop drop" যেন দূরাগত পুনর্জন্মের অবিশ্বাস্য আভাসের মতো মনে হয়।

এই দূরাগত পুনর্জন্মের বিস্ময়কর অবিশ্বাস্য আভাস আমরা এলিয়টের বন্ধ্যাভূমির নরকের প্রাথমিক অংশেই পেয়েছি। সেই কাব্যের প্রথম পর্বে অবাস্তব নগরী লণ্ডনের সেতুর উপর দিয়ে বহমান মৃতকল্প মানুষের স্রোতের মধ্যে পরিচিত একজনকে পেয়ে কবি তাকে ডাক দিয়ে এমন এক মর্মান্তিক

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন যে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে সেই মুমূর্ষু গড্ডলপ্রবাহ যেন সেই প্রশ্নে স্তম্ভিত হয়ে থেমে গেছে—

That corpse you planted last year in your garden,
Has it began to sprout ? Will it bloom this year ?
Or has the sudden frost disturbed its bed ?

শব কি জেগে উঠবে, উদ্যানের উর্বর মৃত্তিকায় সে কি পুষ্পিত হয়ে উঠবে, পুনর্জন্মের এক কম্পমান অনিশ্চিত প্রত্যাশা এই পংক্তিসমবায়ে প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থের' উপর যে কবিতাটির প্রতিবিম্বন স্পষ্টতই বর্তমান সেই 'Journey of the Magi' কবিতাটিতে এই একই পরিকল্পনা রূপায়িত। অভিযাত্রী বৃদ্ধ Magus দেশে ফিরে এসে বুঝতে পারছে সে আর পূর্বের মানুষ নেই—বেথলেহেমের পশুশালায় যে-শিশুর জন্ম সে দেখেছে সেই জন্মই তার পূর্বজীবনের মৃত্যুর কারণ। তার প্রতিমা-পূজক স্বদেশবাসীদের পুরাতন প্রথার সঙ্গে সেই বৃদ্ধ আর নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। সে নূতন করে মৃত্যুর প্রার্থী। সমস্ত 'The Waste Land' কাব্য, শুধু তাই নয়, এলিয়টের পরবর্তীকালের সব কাব্যই সেই পাপ থেকে পরিত্রাণের, মৃত্যু থেকে উদ্ধারের, পুনর্জন্ম কাব্য।

দান্তের দীর্ঘকায় পাপ-শুদ্ধি উদ্ধারের মহাকাব্য বাদ দিলে কোলরিজের 'The Rime of the Ancient Mariner' কবিতার মধ্যে এই পতন ও পুনর্জন্মের ভাবনা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রূপ লাভ করেছে। এই কাব্যপ্রাঙ্গণে যে কঙ্কালসার নাবিক রাত্রির অপচ্ছায়ার মতো দেশে দেশে ভ্রমণ করে এবং অপরিচিত অনিচ্ছুক জনকে নিজের পূর্ব পাপ-কাহিনী শুনিয়ে শুদ্ধিক্রিয়া করে সেই নাবিক যাত্রার পূর্বাহ্ণে যা ছিল, মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার ফলে পরিণামে আর তা নেই। এই নাবিকও অন্য সব নিরুদ্দেশ যাত্রার মাতাল তরণীর নাবিকের মতো অজানার উদ্দেশে যাত্রা করেছিল, পৌঁছেছিলও সে কল্পনায় সমৃদ্ধ সেই দক্ষিণ মেরুলোকে যে মেরুদেশ তখনো বিজ্ঞানবলে বলীয়ান পৌনঃপুনিক অভিযাত্রীর পদস্পর্শে নিজের বাড়ির শব্জিবাগানের মতো পরিচিত হয়ে ওঠে নি। যে কল্পজগতের স্বপ্ন হোমারের ও দান্তের ইউলিসিস্ দেখেছিল, যে কল্পনা সর্বযুগের কবিচিত্তকে উত্তেজিত করে তুলেছে, এলিজাবেথের যুগে দুঃসাহসী নাবিকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত কবিদের অতৃপ্ত কল্পনার ইন্ধন জুগিয়েছে, তার সমস্ত রোমাঞ্চকর উপকরণই সেই মরকতের মতো সবুজ বরফ রচিত

প্রদেশে বর্তমান ছিল। কিন্তু সেই সর্বত্রব্যাপী তুষারের মধ্যে জাহাজ বন্দীকৃত এবং যখন চারিদিকে বিদীর্ণ তুষারের চিৎকারে-গর্জনে মুখর তখন বোঝা গেল অন্যসব রোম্যান্টিক কবির অনুসরণে যে-স্বর্গে এই তরণী এসে উপস্থিত হয়েছে সে নিতান্তই ভুল স্বর্গ।

সমস্ত দায়িত্ব, সামাজিক কর্তব্য, নীতিনিয়মের অনুশাসনকে উপেক্ষা করে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যে যে কল্পবিশ্ব রচিত সেই পৃথিবীতে প্রয়াণ যে সঙ্গত নয়, বরং জীবনের সংঘর্ষ-সংঘাতের মধ্যে বাস করে তারই দাহে নিজেকে ক্রমান্বয়ে শুদ্ধতর ও যোগ্যতর করে নেওয়া কর্তব্য, এই উপলব্ধির প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের রচনায় বহু পূর্বকাল থেকেই আমরা পাই। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাটি যে 'সোনার তরী"র অন্তর্ভূক্ত সেই "সোনার তরী"র 'ঝুলন' কবিতায় কবি সঙ্গিনীর সান্নিধ্যে—

ব্যথা পাছে লাগে, দুখ পাছে জাগে,
নিশিদিন তাই বহু অনুরাগে
বাসর শয়ন করেছি রচন
কুসুম থরে

কিন্তু কিছুদিন পরেই "কুসুমের হার লাগে গুরুভার", "শুধু রাশি রাশি শুষ্ক কুসুম" আর ক্লান্ত প্রাণকে তৃপ্ত করতে পারে না, তাই মরণদোলার আঘাতে স্বপ্ন ভেঙে পরিণামে তাঁকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। এই কবিতাপ্রসঙ্গেই কবি অন্যত্র বলেছেন, "আমার অন্তরতম আমি আলস্যে, আবেশে, বিলাসের প্রশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ে ; নির্দয় আঘাতে তার অসাড়তা ঘুচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে তবেই সেই আমার আপনাকে নিবিড় করে পাই"—আমাদের মধ্যে আত্মার বিকাশের যে সম্ভাবনা তা শুধু সৌন্দর্যমণ্ডিত মদগন্ধী কমলবনের সাহচর্যে সার্থক হয়ে উঠতে পারে না, তার ক্রমান্বয় শুদ্ধির জন্য মৃত্যুর মতো কঠিন কোনো প্রচণ্ড আঘাত প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধির পরিচয় খুঁজলে এমনকি নবযৌবনের 'কড়ি ও কোমলে'র মধ্যেও পাওয়া যাবে। সুতরাং এ কথা বলা চলে না যে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' থেকে 'শিশুতীর্থে' রবীন্দ্রনাথের যে মানস-বিবর্তন তা কালরেখার অনুক্রমে পরিচালিত, বরং কখনো কখনো দেখা যায় সমসাময়িক কালেই দুটি উপলব্ধি একই সঙ্গে প্রকাশিত। কিন্তু এই সতর্কতা মেনে নিয়েও বলা যায় যে, মোটের উপর যে উপলব্ধিগুলি অপারণত-ভাবে আদিতে বর্তমান ছিল তা পরবর্তীকালেই পরিণতি ও যথার্থ বিকাশ

লাভ করেছে ; পরবর্তীকালের কবিতায় নিরুদ্দেশ যাত্রার উধাও আকাঙ্ক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা যায় না। জীবনের অভিজ্ঞতার প্রসার, কলুষ কালিমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর পরিচয়, যার প্রমাণ চিত্রাবলীতে প্রকাশিত অন্তত্র প্রচ্ছন্ন, এই কারণগুলিই হয়তো পূর্বের বীজাকার উপলব্ধির আত্মপ্রকাশের ও নিষ্ঠার প্রগাঢ়তার জন্য দায়ী। বরং বলা যায় শুদ্ধ রোম্যান্টিক দিবাস্বপ্ন "আপন মলিন ক্লিন্ন দেহমাংসের অক্লান্ত লোলুপতা দিয়ে" যে 'কল্পস্বর্গ' রচনা করে শিশুতীর্থ-পর্যায়ে এসে তা এখন স্পষ্টতই নিন্দিত। সুতরাং সংক্ষিপ্ততম সূত্রাকারে বলা চলে নিরুদ্দেশ যাত্রা থেকে শিশুতীর্থে উত্তরণ—এই হল রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের বিবর্তনের ইতিহাস। 'নিরুদ্দেশ যাত্রার' শেষে অন্ধকার নেমে এসেছে, কবি উপলব্ধি করেছেন যে সঙ্গিনী "কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না নীরব হাসি"। অস্তাচলবাসিনী গৌরবশশী উর্বশী অস্তমিত হওয়ায় রোম্যান্টিক কল্পনার নিরঙ্কুশ বিকাশ যে সম্ভব নয়, সেই উপলব্ধির ফলে প্রথম যুগে একটি প্রচ্ছন্ন বেদনা ও বিষাদবোধ ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে নিজের প্রত্যয়ের মধ্যে পুনর্জন্মে বিশ্বাসের সুনিশ্চিত আসন অনুভব করেই বোধহয় সেই শোকবোধ অবলুপ্ত। এখন কবি কোলরিজের বয়োবৃদ্ধ নাবিকের মতো কল্পনার মেরুদেশ ত্যাগ করে শুদ্ধির সন্ধানে পুনর্জন্মের প্রত্যাশায় শিশুতীর্থের পথে যাত্রী। যীশুর জীবনকাহিনী ও 'এনশেণ্ট মেরিনার' কবিতার মতো শিশুতীর্থের ও কাব্যবিষয় যে নবজীবনের উদ্বোধন তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ, 'বিচিত্রা' পত্রিকার প্রকাশকালে কবিতাটির শিরোনাম ছিল, 'সনাতনম্ এনম্ আহুর্ উতাদ্যস্যাৎ পুনর্ণবঃ।—অথর্ববেদ', অর্থাৎ ইনি সনাতন, ইনিই অদ্য পুনর্ণব।

তিন

একই কাব্যবিষয় রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থ' ও কোলরিজের 'এনশেণ্ট মেরিনার'কে অনুপ্রাণিত করায় এই দুটি কবিতার তুলনামূলক আলোচনা কবিতাদুটির তাৎপর্য উপলব্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে বলে আমার মনে হয়। বিশেষত 'শিশুতীর্থের' সবলতা এবং দুর্বলতা আবিষ্কারের পক্ষে, রবীন্দ্রনাথের মানসভঙ্গি ও কোলরিজের মানসভঙ্গির নিগূঢ় সাদৃশ্য ও পার্থক্য আবিষ্কারের পক্ষে এই তুলনামূলক আলোচনা বিশেষ ফলপ্রদ হবে বলে আমি মনে করি। দুটি কবিতাই খ্রীষ্টজীবনকাহিনীর মধ্য দিয়ে নবজীবন-প্রত্যয়কে প্রস্ফুটিত করে

তুলেছে। খ্রীষ্টের মীথ যে 'শিশুতীর্থে'র কেন্দ্রগত বিষয় তার আলোচনা পূর্বেই করেছি। এই প্রবীণ সাধকের বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কাহিনীর মধ্যেও যে সেই একই ফলদায়িনী মীথ বর্তমান তার বহু ইঙ্গিত কোলরিজের কবিতাটির মধ্যে বিদ্যমান। মীথকে অবলম্বন করে সাহিত্যরচনা করার সুবিধা এই যে কবি তাতে জীবনের মৌলিক সমস্যায় নিজের প্রতিভাকে ব্যাপৃত করতে পারেন, এবং সচরাচর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মীথের কোনো স্পষ্ট যোগ না থাকা সত্ত্বেও তার-মধ্য দিয়ে জীবনের সেই সব কেন্দ্রীয় সত্যকে প্রকটিত করে তোলা যায়, যার ঔজ্জ্বল্য এবং দীপ্তি প্রত্যক্ষ-ভাষণের ফলে অনেকাংশে নষ্ট হয়ে যেত। 'এনশেণ্ট মেরিনা'র এক দিকে একটি নিজস্ব স্বাতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত কাহিনী, অপরদিকে মানুষের আত্মার জটিল অন্ধকারে মণ্ডিত ইতিহাসের একটি অত্যাশ্চর্য মীথ-ও বটে। বরং এদিক থেকে বিচার করলে 'শিশুতীর্থে'র মধ্যে কাহিনীগুণ নিতান্তই কম ; 'এনশেণ্ট মেরিনার'কে একটি রোমাঞ্চকর কাহিনীরূপে উপভোগ করার যে সুযোগ মেলে, সেই গল্পের গুণ 'শিশুতীর্থে' অনেকাংশে অনুপস্থিত।

প্রকৃত প্রস্তাবে নাবিকের গল্পে অ্যালবাট্রসের হত্যা খ্রীষ্টানের ধর্মগত ইতিহাসে খ্রীষ্টের হত্যারই প্রতীক। "The Albatross, which is related to the Dove of the Holy Spirit, and through him to the innocent victim, Christ..."[১] কুয়াশার মধ্য দিয়ে আগত পথপ্রদর্শক দেবদূতের মতো যে সামুদ্রিক পাখি তাকে নাবিক 'Christian soul' বলে ঈশ্বরের নামে সংবর্ধনা জানিয়েছিল। নাবিকেরা যখন সায়ংকালীন প্রার্থনায় রত হত তখন সেই পাখি মাস্তুলে স্থির হয়ে বসত। যখন শাস্তি শুরু হয়েছে, সমস্ত সমুদ্র যখন মনে হচ্ছে পচনশীল তখন খ্রীষ্টের নামে বারবার তারা কাতর প্রার্থনা করেছে, অবশেষে পাখি হত্যার বিষময় ফলে উৎপীড়িত যাত্রাসঙ্গীরা মৃত পাখিটিকে এনশেণ্ট মেরিনারের গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে।

Instead of the cross, the Albatross
About my neck was hung.

—"অপরাধের শৃঙ্খলে আপন বলির কাছে তারা বাঁধা"। যে 'holy rood'-এর নামে নাবিক শপথ করে তার বিবরণ বলেছে সেই কাষ্ঠদণ্ড ক্রুশকাঠ ছাড়া

১ Enchafed Flood—Auden.

অন্য কিছুই নয়। রোম্যান ক্যাথলিকগণ যেমন স্বীকারোক্তির অন্ধকার অনালো কুঠরির মধ্যে অপরিচিত ফাদার কনফেসরের কাছে পাপকাহিনী বলে মুক্তি পেতে চায়, ভারমুক্ত হতে চায়, তেমনি বিবাহসভার অপরিচিত অতিথিকে ধরে তার পাপকাহিনী বৃদ্ধ নাবিক বিবৃত করেছে। পূর্বকৃত অপরাধ স্খালনের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনারত খ্রীষ্টানদের মতো আজ এই অপরাধী অনুতপ্ত বৃদ্ধ নাবিক 'kirk' বা ভজনালয়ে সমবেত হয়।

শেষ পর্যন্ত যে উদ্ধারকর্ম, দুটি কবিতাতেই তা সম্পাদিত হয়েছে এক সাধুকল্প পুরুষের দ্বারা। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বিভূতি যে কিছু পরিমাণে অর্জন করেছে, সংসারের তাৎক্ষণিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে যে জড়িয়ে পড়েনি, যে অন্য মানুষের তুলনায় নির্বিকার ও নির্লিপ্ত বলেই অনেক কিছুকে ক্ষমা করার উদার শক্তি অর্জন করেছে সেই শেষে অপরাধীকে পরিণামে মুক্তির পথ দেখিয়েছে। যখন মুক্তির উপায় খুঁজে পায় নি রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থে'র যাত্রীরা, রক্তমাখা হতমানুষটির সামনে থেকে পালিয়ে যেতে চায়, পালিয়ে যেতে পারে না—তখন পূর্বদেশীয় বৃদ্ধ এসে পরিত্রাণের পথ জানিয়েছে—আমরা যাকে মেরেছি তারই অদৃশ্য উপস্থিতি পথ দেখাবে। তারই নির্দেশে শেষ পর্যন্ত তারা এসে পৌঁছেছে অনির্বচনীয় স্তব্ধতায় পরিবেষ্টিত তালীকুঞ্জতলের পর্ণকুটিরে। অনুরূপ ভাবে যাত্রার পরিণামে অনুতাপের দগ্ধতার মধ্য দিয়ে স্বদেশে পৌঁছে সেই সাধুর কাছে বৃদ্ধ নাবিক কাতর প্রার্থনা জানিয়েছে—"O shrieve me, shrieve me, holy man", অপরাধের স্বীকারোক্তি শুনে তার পাপ থেকে সে তাকে মুক্ত করুক। নাবিক অনুভব করেছে প্রভাতে-দ্বিপ্রহরে-সন্ধ্যায় নতজানু হয়ে যে সাধু প্রার্থনা করে একমাত্র সেই তার অপরাধের গুরুত্ব, অনুতাপের গভীরতা উপলব্ধি করে যথাসাধ্য মুক্তি দিতে পারবে। অপরপক্ষে, দুটি কবিতারই যে রূপক মূল্য অধিকতর এই কথা স্পষ্ট করে তোলার জন্যই যেন দুটি কবিতার চরিত্রগুলিকে যথাসম্ভব ছায়াময় ও বিশিষ্টতাহীন করে রাখা হয়েছে। যে পথপ্রদর্শককে 'শিশুতীর্থে'র যাত্রীরা হত্যা করেছে তার কোনো মানবিক বৈশিষ্ট্য দান করা হয়নি, সে নিরবয়বভাবে তার প্রতীক-কর্ম সম্পাদন করেছে। শুধু যে বিবাহসভার নিমন্ত্রিত অতিথির কোনো ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য নেই তা নয়, যেন সে নাটকের তুচ্ছ চরিত্র এমনিভাবে কোলরিজের কবিতার নায়ক বৃদ্ধ নাবিক উজ্জ্বল চক্ষুতারকার সম্মোহনশক্তি ও শীর্ণকায় বাহ্য ছাড়া অন্য কোনো বৈশিষ্ট্যে ভূষিত হয় নি। রাত্রির মতো সে দেশে দেশে ভ্রমণ

করে, রাত্রির মতোই সে অস্পষ্ট, প্রায় অশরীরী। 'শিশুতীর্থে'র অন্য যাত্রীগণ, কোলরিজের কবিতার অন্য নাবিকগণ, যেহেতু সাধারণ মানুষের আচরণের প্রতীক, সাধারণ মানুষের মতোই যেহেতু তারা ফলাফল দিয়ে কাজের ন্যায়-অন্যায় বিচার করে সেই কারণে তাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব দান করা হয় নি। গ্রীক নাট্যের কোরাসের মতো কখনো তারা ঘটনার ব্যাখ্যাতা, কখনো শ্রোতা বা পাঠকের মনের সাধারণ প্রতিক্রিয়া প্রকাশের বাহন। তাদের ভাব, যন্ত্রণা, অপরাধ সবই যূথবদ্ধ। গ্রীকনাট্যের কোরাসের মতোই 'শিশুতীর্থে'র অপর যাত্রীরা, কোলরিজের অপর নাবিকেরা ব্যক্তিত্ববর্জিত 'Collective protagonist' (নিকল)। রাত্রির অন্ধকারে ভিড়ের মধ্যে একজন যখন অভিনেতাকে ভর্ৎসনা করল, তখন অন্যেরাও সেই তিরস্কারে কণ্ঠ মিলিয়েছে, একজন সাহসিক যখন হত্যার জন্য আঘাত করল তখন ব্যক্তিত্ববর্জিত ভিড়ের যৌথ-হাত সেই আঘাতের পর পুনঃপুনঃ আঘাত করেছে। সর্বসাধারণ অধিনেতার শিক্ষার তাৎপর্য বোঝে নি, অন্ধ আনুগত্যে তাকে অনুসরণ করেছে কিছুকাল, তারপর তাৎক্ষণিক পুরস্কার না পেয়ে সেই আনুগত্য হারিয়ে অন্যের পরামর্শে প্রাক্তন নেতার বিরুদ্ধে হত্যার কৃতঘ্ন ছুরি তুলতে কুণ্ঠিত হয় নি। এই ব্যক্তিত্বহীন গড্ডলপ্রবাহের মূল্যবিচারক্ষমতা থাকে না বলেই ফলাফল-নিরপেক্ষভাবে ন্যায়বিচার করা তার পক্ষে সম্ভব নয়—এনশেণ্ট মেরিনার অ্যাল্‌বাট্রসকে হত্যা করায় অন্যান্য নাবিকেরা প্রথমে এ কাজকে 'hellish thing' বলেছিল, সুপবন বওয়ামাত্র তাদের মত পাল্টে গেল "Twas right, said they, such birds to slay", কিন্তু বাতাস যখন পড়ে গেল, আকাশ যখন তপ্ত হয়ে তাম্রবর্ণ ধারণ করল তখন তাদের দ্বিতীয়বার মত পরিবর্তন করতে হয়েছিল। 'শিশুতীর্থে'ও দেখি প্রথমে হত্যাকাণ্ডে সকলেই সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল কিন্তু পরে "অপরাধের অভিযোগ নিয়ে মেয়ে-পুরুষে তর্ক তীব্র হতে থাকে"। এমনিভাবে দৈবাদেশ লঙ্ঘন করে শয়তানের প্ররোচনায় আপেলফল ভক্ষণের ফলে মিল্‌টনের আদম ও ঈভ প্রথমে নিরতিশয় আনন্দ লাভ করেছিল কিন্তু সেই আনন্দ অচিরেই কেটে গেল, স্বর্গভ্রষ্ট আদম-ঈভ তখন এই নির্বাসনের জন্য দায়ী কে এই নিয়ে কোলরিজের নাবিকদের এবং রবীন্দ্রনাথের যাত্রীদের মতো পরস্পরের উপর দোষারোপ করেছে।

দুটি কবিতারই কেন্দ্রীয় ঘটনা পথপ্রদর্শককে হত্যা। 'শিশুতীর্থে'র হত্যার

পিছনে কারণ অনুমান করা যায়, যে সুখবিলাসময় লক্ষ্যে তারা পৌছুবে এই প্রত্যাশা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল, সেই লক্ষ্য অর্জিত না হওয়াতেই তাদের ক্রোধ এবং এই ক্রোধেরই বিস্ফোরক প্রকাশ নিষ্ঠুর হত্যায়। এনশেণ্ট মেরিনারের হত্যা আরো ভয়াবহ, কেননা এই হত্যা শুধু পথপ্রদর্শককে নয়, নিরীহ অতিথিকেও এবং এই হত্যা নিষ্কারণ। কুজ্ঝটিকের ভিতর থেকে যে পাখি পথ নির্দেশ করে আনছিল তাকে কি এই প্রবীণ নাবিক বিরক্তি, ক্রোধের, না নিতান্ত খেয়ালের বশে হত্যা করে বসল? "What matters is that the Mariner breaks a sacred law of life. In his action we see the essential frivolity of many crimes against humanity and the ordered system of the world, and we must accept the killing of the albatross as symbolical of them."[১] অবশ্য 'শিশুতীর্থে'র এই হত্যাকারী এবং কোলরিজের বৃদ্ধ নাবিক কৃতকর্মের দ্বারা তাদের স্বাধীন নির্বাচন-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে, যে স্বাধীনতা থেকে ব্যক্তিত্ববর্জিত ভিড় বঞ্চিত, কেননা ন্যায়-অন্যায়ের একটিকে নির্বাচনের অধিকারের মধ্যেই প্রকৃত স্বাধীনতার বীজ নিহিত থাকে। এবং এই স্বাধীনতা ব্যতিরেকে উদ্ধার অসম্ভব। কিন্তু স্বাধীনতা যখন স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয়, সেই স্বেচ্ছাচারী অহংবোধই তখন অতিশয় তীব্র হয়ে বিশ্ববিধানকে উপেক্ষা করে, রক্তপাত ঘটায়। দস্তয়েভস্কির রাস্‌কলনিকফ এবং কারামাজফ ভ্রাতৃবৃন্দের অন্যতম ইভান ভেবেছিল স্বাধীন মানুষ সব কিছুই করতে পারে; রাস্‌কলনিকফ মনে করত সে অতিমানব এবং অতিমানব বলে সে অবলীলায় একটি সুদখোর বৃদ্ধাকে হত্যা করতে পারে, ইভান তার ভাইদের কানে পিতৃহত্যার মন্ত্র জপিয়েছিল এই বলে যে "everything is permissible'। 'শিশুতীর্থে'র কামিনী যৌবনমদবিলসিত নগ্নদেহে অট্টহাস্য করে বলে "কিছুতে কিছু আসে যায় না"। কিন্তু কোলরিজের, দস্তয়েভস্কির এবং রবীন্দ্রনাথের নায়ক পরিণামে বুঝেছে স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে স্বেচ্ছাচারী অহংবোধের জীবনের নৈতিক বিধানকে লঙ্ঘন করার অধিকার নেই।

গ্রীক ট্র্যাজেডি থেকে আরম্ভ করে, শেক্সপীয়রের প্রধানতম ট্র্যাজেডিগুলি এবং দস্তয়েভস্কির উপন্যাসগুলি আলোচনা করলে লক্ষ্য করি যে হত্যা শুধু

১ The Romantic Imagtnation (Chap III)—Bowra.

দের প্রধান নাটকীয় নয়, একেবারে কেন্দ্রীয় ঘটনা। সেই ঘটনার প্রচণ্ড আঘাতের সামনে এসে জীবনের পথ নির্বাচনের স্বাধীনতা চরিত্রসমূহের সামনে খুলে যায়, তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও বিশ্বব্যাপী নৈতিকবিধানের সামঞ্জস্যের তাৎপর্য তখন তারা উপলব্ধি করতে পারে এবং এই প্রগাঢ়তর জীবনবোধের উদ্বোধনের ফলে পূর্বের মানুষ হত্যার অভিজ্ঞতার দাহে স্বতন্ত্র মানুষে রূপায়িত হয়। এবং হত্যা ও ট্র্যাজিক সাহিত্যের মধ্যে ঐতিহাসিক ভাবে একটি নিবিড় যোগসূত্র তাই বোধহয় লক্ষ্য করা যায়। হত্যাকাণ্ড, রক্তপাত বিশ্ববিধানের বিরুদ্ধে চরম অপরাধ। একথা যদি মনে রাখি যে বিশ্বসংসারে সকলেরই জীবনধারণের সমান অধিকার রয়েছে, যদি মনে রাখি অ্যাল্‌বাট্রসকে হত্যা খ্রীষ্টহত্যারই প্রতীক তবে তাকে তীরবিদ্ধ করার ঘটনাকে নিতান্ত তুচ্ছ বলে আর মনে হবে না। যে মুহূর্তে অপরাধী এই চরম অপরাধ করে সেই মুহূর্তে সমস্ত বিশ্বসংসারে জীবনযাত্রার যে বুনোট আছে তার থেকে সে অনিবার্যভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, জীবনের যে জোয়ার-ˉটা প্রত্যেক মানুষ ও প্রাণীকে প্রতি মুহূর্তে স্পর্শ করে যায় তার থেকে হত্যাকারী বঞ্চিত হয়ে এক মৃতকল্প বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। কী মর্মান্তিকভাবে যে অপরাধী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার তীব্রতম উদাহরণ মেলে সম্ভবত ম্যাকবেথ নাটকে। ডানকানের হত্যার পর রৌরবে রূপান্তরিত ম্যাকবেথের দুর্গ সুখ-দুঃখবিজড়িত জীবন-প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, জীবনের স্পন্দন চিরকালের জন্য থেমে গেছে, "The murderers, and the murder, must be insulated—cut off by an immeasurable gulf from the ordinary tide and succession of human affairs,"[১] এমন সময় দুর্গদ্বারে করাঘাতের মধ্য দিয়ে জীবনপ্রবাহ যে পুনরায় চলতে আরম্ভ করল তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে এবং জীবনের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য এই সময় থেকেই ম্যাকবেথের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হল—"The reaction has commenced: The human has made its reflux upon the fiendish."[১] 'শিশুতীর্থে'ও এই উপলব্ধির অস্পষ্ট আভাস পাই। "একজনের পর একজন উঠলো, আঘাতের পর আঘাত করলে, তার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।" তারপরেই একটিমাত্র হ্রস্বকায় পংক্তিতে বলা হল—

১ On Knocking at the Gate in Macbeth—De Quincey.

"রাত্রি নিস্তব্ধ"। জীবনযাত্রার ধ্বনি সেই অপরাধ-বোধের গুরুতরভাবে বোবা হয়ে গেছে। কিন্তু আতঙ্কে একটি মুহূর্ত সব স্তম্ভিত হয়ে যাবার পর ম্যাকবেথের দুর্গদ্বারে করাঘাতের মতো জীবনস্রোত চলৎশক্তি ফিরে পেল—ঝরনার মৃদুশব্দ দূর থেকে ভেসে আসতে আরম্ভ করল, বাতাসে ভেসে বেড়াতে আরম্ভ করল যূথীর মৃদুগন্ধ। সংসারের সম্পর্ক থেকে হত্যাকারীর, পাপাচারীর এই বিচ্ছিন্নতাবোধ এনশেণ্ট মেরিনারের মধ্যে অনেক বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, 'শিশুতীর্থে'র মতো অস্পষ্টভাবে নয়, ম্যাকবেথের মতো সুতীব্র সংহত আয়রনির মধ্য দিয়ে নয়। নাবিকেরা 'silence of the sea'-কে ভেঙে দেবার চেষ্টায় জোর করে কথা বলে এবং—

Alone, alone, all, all alone
Alone on a wide wide sea l
And never a saint took pity on
My soul in agony.

যে-সহচরদের নিয়ে নাবিক একদা যাত্রা করেছিল, যারা তার অপকর্মের প্রাথমিক সমর্থক ছিল তাদের কোটরগত মৃতচক্ষুর অভিশাপ আজ তাকে নিরন্তর তিরস্কৃত করছে।

হত্যার পর ডানকানের রক্তে লিপ্ত হাত নিয়ে বিকারগ্রস্তের মতো অপেক্ষমানা স্ত্রীর কাছে ম্যাকবেথ এসে উপস্থিত হয়েছে এবং উদ্‌ভ্রান্তের মতো এই মর্মঘাতী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে—

But wherefore could not I pronounce 'Amen' ?
I had most need of blessing, and 'Amen'
Stuck in my throat.

কোলরিজের বৃদ্ধ নাবিক অপরাধের অব্যবহিত পরে, সমুদ্রের সঙ্গীহীন দুঃসহ একাকীত্বে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা উচ্চারণ করতে চেয়েছে কিন্তু ইতিমধ্যে অনুতাপ যেহেতু তার হৃদয়ক্ষেত্রকে সিক্ত করে নি সেই কারণে প্রার্থনা তার মুখ থেকে নির্গত হয় নি। সে উপলব্ধি করেছে অনুশোচনাহীন যে-হৃদয় 'dry as dust', তার মধ্যে প্রার্থনা পুনর্জন্মের বীজ বপন করতে পারে না। 'শিশুতীর্থে' যখন সূর্যরশ্মির তর্জনী এসে রক্তাক্ত মৃত মানুষের শান্ত ললাটদেশ স্পর্শ করল তখন "মেয়েরা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলো, পুরুষেরা মুখ ঢাকলো দুই হাতে।"

কিন্তু এই পর্যন্ত মোটামুটি সাদৃশ্যের পর দুই কবির চেতনার মধ্যে, জীবনবোধের মধ্যে যে দুরতিক্রম্য পার্থক্য ছিল সেই পার্থক্যকে আমরা পাই। হত্যার পর এনশেণ্ট মেরিনার অনুতাপের অগ্নিতে দগ্ধ হয়েছে; তার পাপাচারী প্রাণের মৃত্যু শ্রেয় নয় তাকে জীবন্মৃত অবস্থায় রাখা শ্রেয় এ-কথা স্থির করার জন্য পাশাখেলার আয়োজন করা হয়েছে এবং সেই খেলায় সঙ্গতভাবেই স্থিরীকৃত হয়েছে জীবনমৃত্যুর সীমান্তপ্রদেশে তাকে রেখে প্রচণ্ড যন্ত্রণার উত্তাপের মধ্যে শুদ্ধ করে পুনরায় প্রাণের এলাকায় তাকে নিয়ে আসা হবে। ডাইনীর কটাহে নীলসবুজবর্ণ অগ্নিশিখার যে লেলিহান জিহ্বা, সমুদ্রের যে পচনশীলতা, সমুদ্রবক্ষে বিকৃত-জন্মা কুৎসিত পিচ্ছিল সরীসৃপাকার জীবসমূহের যে আনাগোনা, আকণ্ঠ তৃষ্ণা, সবই সেই অনুতাপ-অনুশোচনার প্রতীক, যা সেই নাবিকের পাপকে ক্রমান্বয়ে স্খালন করে চলেছে। সূর্যতাপে উত্তপ্ত পাটাতনের উপর মৃত যাত্রাসহচরদের সঙ্গে তাদের অভিশাপতীব্র চোখের সম্মুখে তাকে দিনের পর দিন যাপন করতে হয়েছে। পরিণামে যখন সে অহংবোধের একগুঁয়েমি থেকে নিজের অজ্ঞাতসারে মুক্ত হয়েছে, যখন পিচ্ছিল প্রাণীগুলিকে তার সুন্দর বলে মনে হয়েছে, উপরন্তু তাদের অজ্ঞাতসারে আশীর্বাদ করতে পেরেছে তখনই দেবদূতের করুণা তার উপর বর্ষিত হয়েছে, গুরুভার ক্রুশকাঠের মতো অ্যাল্‌বাট্রস তখন তার গলা থেকে খসে সমুদ্রমগ্ন হয়েছে। এতদিন ঘুমুতে পারে নি, এবার ঘুম এসেছে; এতদিন তৃষ্ণায় কণ্ঠতালু শুকিয়ে গিয়েছিল, এবার বৃষ্টিপতনের স্বপ্ন দেখার পর জেগে উঠে দেখেছে শুধু তার ঠোঁট ভিজে বা কণ্ঠ শীতল বা পোশাক সিক্ত নয়, উপরন্তু "my body drank"। এই কাব্যে প্রায়শ্চিত্য উদ্ধারের সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত, প্রথমটি ব্যতীত দ্বিতীয়টি অসম্ভব।

যে বিকারের মধ্যে বসে প্রায়শ্চিত্যের দগ্ধ দিনগুলিকে এনশেণ্ট মেরিনার যাপন করেছে তার অনুরূপ বিকারের চিত্র 'শিশুতীর্থে'-ও পাই। কোলরিজের কবিতায় পিচ্ছিল সরীসৃপকে দেখে মনে হয়েছিল বিকৃতজন্মা অপপ্রাণীর সমাবেশ, 'শিশুতীর্থে' "পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমা গুহার গর্তে সংলগ্ন, মনে হয়, নিশীথরাত্রের ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ" এবং অন্যত্র "বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলো যেন বিকারের প্রলাপ, অসম্পূর্ণ জীবনলীলার ধূলিবিলীন উচ্ছিষ্ট"। এক কবিতায় সমুদ্রের জল তেলের মতো / মন্থরগামী এবং দূষিত, অন্য কবিতায় বিসর্পিত

অস্ফুট ধ্বনির ধারা শুনে মনে হয় "অগ্নিগিরি নিঃসৃত গদ্‌গদ্‌কলমুখর পঙ্কস্রোত"। কিন্তু কোলরিজের কবিতায় হত্যার ঘটনাকে বর্ণনাকালে খুবই যেন অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার এমনিভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে হত্যাকালে ব্যাপারটিকে নাবিক তুচ্ছ ব্যাপার বলেই মনে করেছিল, এর ফল যে এত সুদূরপ্রসারী হবে সেদিন সে কল্পনাও করে নি। রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থে' অপরপক্ষে হত্যাকাণ্ডটিকে অত্যন্ত নাটকীয় আকস্মিকতা, সুতীব্র সংহতি দেওয়া হয়েছে; রবীন্দ্রনাথের অন্য কোনো কবিতায় এমন প্রচণ্ড বিস্ফোরক নাটকীয়তা আছে বলে আমার জানা নেই। হেগেল নাটকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 'totality of action'-এর কথা বলেছেন 'শিশুতীর্থে'র কেন্দ্রগত ষষ্ঠভাগে তা প্রকটভাবে উপস্থিত—পর্যায়ে পর্যায়ে দেখি জনতার মধ্য থেকে এগিয়ে এসে জনৈক মানুষ অভিযোগ করল, এক কণ্ঠ থেকে অন্য কণ্ঠে সেই ফাঁকির অভিযোগ ক্রমান্বয়ে উচ্চতর স্বরগ্রামে সমর্থিত হল, বিদ্বেষের বিষে তর্জন বিষাক্ত হল, অবশেষে হত্যাকারী করল ছুরিকাঘাত, ছুরির ফলক হয়তো অন্ধকারে ঝিকিয়ে উঠল কিন্তু যে হত্যাকারী "অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না"। নাটকের "gesture in turn, are so startling that they reverberate inside the language, not like a physical reality narrated at some remove, but like an explosive image or metaphor unleashed by the force of syntax....It is the essence of drama that speech should move and motion speak,"[১] নাটকের পক্ষে বিশেষত ট্র্যাজিক নাটকের পক্ষে এই কথা সত্য এবং তা যদি সত্য হয় তবে ভঙ্গিভাষী নাটকের প্রধান গুণেই 'শিশুতীর্থে'র এই অংশ ভূষিত। এনশেন্ট মেরিনারের হত্যাকাণ্ড নাটকীয় নয়, 'শিশুতীর্থে'র সুতীব্রভাবে নাটকীয়, কিন্তু কবিদ্বয়ের জীবনবোধের পার্থক্যের ফলে আমরা এখানে এক কূটাভাস বা প্যারাডক্সের সম্মুখীন হই—লক্ষ্য করি, রবীন্দ্রনাথের বর্ণিত হত্যাকারী বা তার সমর্থকদের প্রায়শ্চিত্য নেই, অপরপক্ষে নাটকীয় না হওয়া সত্ত্বেও কোলরিজের কবিতায় প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে ট্র্যাজিক শুদ্ধি অর্জিত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এনশেন্ট মেরিনারের সদৃশ যে বিকারগ্রস্ত দৃশ্য ও বস্তুগুলির বর্ণনা 'শিশুতীর্থে'

১ Tolstoy or Dostoyevsky (Chap. III)—Steiner.

...ন সেগুলি এনশেন্ট মেরিনারের মতো আভ্যন্তরীণ প্রায়শ্চিত্তের তীব্রতার
...িক রূপায়ণ নয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে, অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করি যে
...তীর্থে' ঐ বস্তুর বিকার হত্যার পরে দেখানো হয় নি, তাদের বর্ণনা
...র পূর্বভাগে করা হয়েছে যখন হত্যার অপরাধে যাত্রীদের হাত
...ষিত নয় এবং প্রায়শ্চিত্তের প্রশ্নই যখন ওঠে না। অথচ হত্যার পর
...রাধের দায়িত্ব নিয়ে মেয়ে-পুরুষে তর্ক ছাড়া এবং অপরাধের শৃঙ্খলে
...রা হত মানুষটির সঙ্গে বাঁধা এই উক্তি ছাড়া অপরাধের শাস্তির কোনো
...ণ এই কবিতায় পাই না—সূর্যরশ্মির শুভ আলো অচিরেই আকাশ
...িত করে দিয়েছে, সংশয় থেকে অতি সত্বর পূর্বদেশীয় বৃদ্ধ তাদের
...র করেছে। আসলে কোলরিজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই মৌলিক
...ক্যের কারণ হেনরী জেমস্ যাকে 'imagination of disaster' বলেছেন
... কোনোদিন রবীন্দ্রনাথের শুভবাদী প্রত্যয়ের মধ্যে ছিল না, সেই প্রত্যয়ে
...gic agon অনুপস্থিত। গর্কি তলস্তয় সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতিচিত্রে বলেছেন
...e probably has thoughts which he fears ।" এবং সেই সংশয়পরায়ণ
...াগুলিকে তিনি নিজের অন্তরে গোপন করে গিয়েছেন। তেমনি
...ন্দ্রনাথের মধ্যেও হয়তো এমন ভয়াবহ ভাবনা কখনো কখনো দেখা
...য়েছে, চিত্রাবলী যার সাক্ষ্য, কিন্তু ভারতীয় উপনিষদের স্তন্যরসে বর্ধিত
...তাবাদে প্রতিষ্ঠিত কবি রবীন্দ্রনাথ সেই ভীতিপ্রদ চিন্তাসমূহকে প্রশ্রয়
...ন নি। আগেই দেখেছি 'Journey of the Magi'-তে এলিয়ট জোর
...য়েছেন মৃত্যুর দিকে, রবীন্দ্রনাথ 'শিশুতীর্থে' জোর দিয়েছেন জীবনের দিকে।
...শেন্ট মেরিনারের সঙ্গে তুলনাকালে লক্ষ্য করি কোলরিজ প্রায়শ্চিত্যকে
...্যার অবশ্যম্ভাবী ফল বলে মনে করেছিলেন এই অর্থে যে স্বাধীন চিত্তবৃত্তি
...তাপকেই উদ্ধারের উপায় বলে নির্বাচন করে। পাপ বাইরের তিরস্কারে
...ি পায় না, পাপের আভ্যন্তরীণ প্রবর্তনাতেই উদ্ধারের, পরিত্রাণের বীজ
...মান। যদি মনে রাখি পচনশীল সমুদ্র, পিচ্ছিল সরীসৃপ, ডাইনীর কটাহের
...শিখা সবই নায়কের চিত্তদাহের বহিরঙ্গ রূপায়ণ, আসলে সে ব্যাপারগুলি
...তাপপীড়িত হৃদয়ের অভ্যন্তরেই ঘটেছে, তবে বুঝব তার শুদ্ধি বাইরের
...দেশে নয়, ভিতরের তাড়নায় সম্ভবপর হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যেহেতু
...ন করতেন শুভ ও মঙ্গলের বিবর্তনের ইতিহাসে পাপ একটি মুহূর্তমাত্র,
...নকি সবচেয়ে মূল্যবান বা অনিবার্য মুহূর্তও নয়, এই উদ্বর্তনবাদী

আশাবাদ তাঁর জীবনমূলে সুপ্রতিষ্ঠিত বলেই শুদ্ধির পথে প্রায়শ্চিত্ত বা শাস্তিভোগের অনিবার্যতা তিনি স্বীকার করেন নি। জীবনের শুভশক্তি এতই প্রবল, তাঁর মতে, যে প্রায়শ্চিত্য-অনুতাপ হোক বা না হোক সেই মাঙ্গলিক শক্তির বিজয় পরিণামে সুনিশ্চিত! মৃত্যুর জন্য যে প্রস্তুত নয়, নবজন্ম লাভও তার জন্য নয়—কণ্টক মুকুটধারী যীশু জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করে গেছেন। কিন্তু সেই নবজন্ম লাভের জন্য যে মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবী যন্ত্রণাদায়ক শর্ত পালনে প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন একথা রবীন্দ্রনাথ মানেন নি। তাই 'শিশুতীর্থে' হত্যার পাপাচারের পর অচিরেই "অন্ধকার ক্ষীণ হলো, প্রভাতের আলো গিরিশৃঙ্গ ছাপিয়ে আকাশ ভরে দিলে"। পূর্বদেশের বৃদ্ধ, আমরা যাকে মেরেছি সেই পথ দেখাবে, এই কথা বলামাত্র নতশিরে সকলে তা মেনে নিল; অপরাধের জন্য কোনো উল্লেখযোগ্য শাস্তি পেতে হয় নি তাদের, অবলীলাক্রমে বিনাশ্রমে "মৃত অধিনেতার আত্মা তাদের অন্তরে বাহিরে" এই বিশ্বাস তারা অর্জন করতে পারল। অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ তাড়নায় নয়, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অনুতাপে নয়, বাইরের নির্দেশে তারা উদ্ধারের পথে যাত্রা করেছে। দস্তয়েভস্কি তাঁর অন্তিম মন্তব্যাবলীর মধ্যে লিখেছিলেন "The Saviour did not descend from the cross because he did not wish to convert men through the compulsion of an outward miracle, but through the freedom of belief।" এনশেণ্ট মেরিনারের অনুতাপের মধ্যে সেই বিশ্বাসের স্বাধীনতার পরিচয় পাই, অপরপক্ষে 'শিশুতীর্থে' যখন বৃদ্ধের আহ্বানমাত্র সকলে কণ্ঠ মিলিয়ে গান ধরল "জয় মৃত্যুঞ্জয়ের জয়" তখন সেই ব্যাপারকে 'outward miracle' বলেই সন্দেহ করি। যদি বলা হয় বৃদ্ধের আহ্বানও আভ্যন্তরীণ বিবেকবাণীর প্রতীক, তাতেও অসুবিধা কাটে না, কেননা বিবেকের বাণীকেও দ্বিধার স্তর পার হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে হয় এবং বিবেকের বাণী ব্যক্তির কাছে আসে, দলবদ্ধ মিছিলের কাছে আসে না। আর দলের একজনের মধ্যে জাগ্রত বিবেকবাণীকে যদি দলের অন্য লোকেরা অন্ধের মতো অনুসরণ করে (পূর্বে যেমন অন্ধের মতো হত্যা করেছিল) তবে তাতে উদ্ধার সম্ভব নয়, কেননা পাপের জোয়াল থেকে উদ্ধারের ব্রত প্রত্যেককেই নিজের পথে স্বেচ্ছায় নির্বাচন করে নিতে হয়। যারা স্বাধীনভাবে অপরাধ করে নি, তাদের পক্ষে স্বাধীনভাবে প্রায়শ্চিত্তের পথ নির্বাচন করা সম্ভব নয়।

সুতরাং তাদের পক্ষে উদ্ধারও সুদূরপরাহত। এই কথা কোলরিজ উপলব্ধি করেছিলেন বলেই হয়তো তিনি অন্যান্য নাবিকসহ জাহাজটিকে বন্দরের কাছে এনে জলমগ্ন করিয়ে দিয়েছিলেন।

জীবনের পাশে মৃত্যুর, মঙ্গলের পাশে পাপ ও অপরাধের সমকক্ষ মর্যাদা রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন দেয়নি বলেই দুটি কবিতায় গভীর পার্থক্য দেখতে পাই। অপরাধের প্রচণ্ড আঘাত জীবনধারাকে কিছুকালের জন্য স্তব্ধ করে দেয় বটে, 'রাত্রি নিস্তব্ধ' হয় বটে কিন্তু তাঁর মতে অপরাধের অকিঞ্চিৎকর শক্তি বৃহত্তর জীবনপ্রবাহের উপর কোনো প্রবল ছাপ রেখে যেতে পারে না। ট্রয় বা মস্কো যদি হোমারের মহাকাব্যে বা তলস্তয়ের উপন্যাসে অগ্নিদগ্ধ হয়ে যায় তবু জীবনের কেন্দ্র টলে না, গ্রামের কৃষিকার্য, ঋতুচক্র, জীবনের পবিত্র প্রবাহ অক্ষুণ্ণ ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। গোলাবারুদে পোড়া অস্টারলিজের প্রান্তর নতুন শস্যের সমারোহ সুনিশ্চিতভাবে ঢেকে দেয়। যেন ট্রয়ের ধ্বংস বা মস্কোর বহ্ন্যুৎসব নিতান্ত সাময়িক ঘটনা এবং এই সব আপাতিক-সাময়িকের অন্তরালে হলচালনা ও জাল-ফেলার মধ্য দিয়ে জীবনের চিরন্তন কেন্দ্র অঞ্চল হয়ে বিরাজ করে। রবীন্দ্রনাথও স্তূপীকৃত পুরনো লোহার ভিতর থেকে জেগে-ওঠা শাশ্বত প্রাণের প্রতীক একটি রক্তকরবীর গাছকেই তাৎপর্যময় বলে মনে করেছিলেন, যেমন তলস্তয় ১৯শে জুলাই ১৮৯৬, তারিখের জার্নালে চষাক্ষেতের মধ্যে একটিমাত্র বারডক ফুলের পুষ্পিত দণ্ডের কথা উল্লেখ করেছেন "black from dust, but still alive and red in the centre"[1] এবং এই দৃশ্যকে তাঁর চোখেও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল একই কারণে। 'শিশুতীর্থে'র যাত্রীদল "সেই ক্ষেত্র দিয়ে চলেছে যেখানে বীজ বোনা হল, সেই ভাণ্ডারের পাশ দিয়ে যেখানে শস্য হয়েছে সঞ্চিত" এবং—

> গিরিপদবর্তী গ্রাম থেকে নদীতলবর্তী গ্রাম পর্যন্ত
> প্রতিদিনের লোকযাত্রা শান্ত গতিতে প্রবহমান।
> কুমোরের চাকা ঘুরছে গুঞ্জনস্বরে,
> কাঠুরিয়া হাটে আনছে কাঠের ভার···।

জীবন যে শুধু থেমে নেই তাই নয়, জীবনের গৌরবহীন মঙ্গলকর্মগুলি

---

১ Steiner-এর প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত।

অপরিবর্তিত এবং অব্যাহত গতিতে চলেছে এনশেণ্ট মেরিনার যে kirk, hill, light-house top পিছনে ফেলে যাত্রা করেছিল, প্রত্যাবর্তনকালেও সে তাদের একে একে দেখতে পেল—মনে হল সে যেন ভয়াবহ অভিজ্ঞতাকে পিছনে ফেলে পূর্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাতেই আবার ফিরে এল। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা তাকে স্বাভাবিক জীবনে প্রবেশ করতে দেয় নি। যখন বিবাহের ভোজসভার কলকোলাহল কানে পৌছায় তখন মনে হয় এনশেণ্ট মেরিনারের অভিজ্ঞতার ফলেও জীবনযাত্রা থেমে নেই, কিন্তু পার্থক্য এইখানে যে 'প্রতিদিনের লোকযাত্রায়' যেমন অবলীলাক্রমে রবীন্দ্রনাথের যাত্রীরা প্রবেশ করতে পারল কোলরিজের নাবিক তা পারে নি। বিবাহের ভোজসভার চেয়ে ভজনালয়ের প্রার্থনা আজ তাকে বেশি আকর্ষণ করে। পূর্ব-অপরাধের ভারে ভাগ্যপীড়িত এই মানুষ তার অপরাধ-পূর্ব জীবনের মানুষে রূপান্তরিত হতে পারে না। যখনই পাপের স্মৃতি গুরুভার মনে হয় তখনই তাকে নূতন করে স্বীকারোক্তি করতে হয়। রাত্রির মতো দেশ-দেশান্তরে তাকে ঘুরে বেড়াতে হয় ; সর্বসাধারণ থেকে স্বতন্ত্র, পাপের দ্বারা চিরকালের জন্য চিহ্নিত এই মানুষ জীবনপ্রবাহের সাধারণ তরঙ্গে আর আন্দোলিত হতে পারে না।

'শিশুতীর্থ' এবং 'এনশেণ্ট মেরিনা'র দুটি কবিতার কেন্দ্রেই Rebirth Archetype বর্তমান। সেই কারণেই আমি দুটি কবিতাকে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করেছি। কিন্তু পুনর্জন্মের সেই কেন্দ্রীয় ঘটনার রূপায়ণেও দুটি কবিতায় পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্য বিচার করলে যাকে আমার 'শিশুতীর্থে'র প্রধান দুর্বলতা মনে হয়, সেই দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 'শিশুতীর্থে' পুনর্জন্ম কার ? একদিকে হত সেই পথপ্রদর্শকের যে মাতৃক্রোড়ে শিশুরূপে পুনর্জন্ম লাভ করেছে ; অপরদিকে হত্যাকাণ্ডে সহায়ক সেই সব মানুষের যারা অবলীলায় নবজাতকের কুটিরদ্বারে সমাগত হবার অধিকার পেয়েছে। কিন্তু যার পুনর্জন্মের প্রশ্ন সবচেয়ে জরুরি সেই প্রথম আঘাতকারী কোথায় গেল ? যে পথপ্রদর্শককে সজোরে আঘাত করল অন্ধকারে সেই মানুষটির মুখ আর দেখা গেল না—তারপর আর কোনো খবর তার আমরা পেলাম না। সে কি দল ছেড়ে পালিয়ে গেল ?—তা সম্ভব নয়, কেননা অপরাধের শৃঙ্খলে সে বলির কাছে বাঁধা। সে কি মিছিলের গড্ডলপ্রবাহের অঙ্গীভূত হয়ে আত্মগোপন করল ?—কিন্তু আত্মগোপন করাও সম্ভব নয়, কেননা সর্বাধিক গুরু অপরাধের টিকা চিরকালের জন্য তাকে অন্য মানুষ

থেকে পৃথক করে দিয়েছে। তার সংবাদ সবচেয়ে জরুরি, কেননা তারই উদ্ধার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তার মুক্তি না হলে অন্য সমস্ত মুক্তিই বৃথা। দস্তয়েভস্কির ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্টে নায়ক নিজে অনুতাপের মধ্য দিয়ে মুক্তি পেয়েছে, পরিত্রাণ পেয়েছে রেজারেক্‌শনের নেখলিউদফ্‌, উদ্ধারের পথে অগ্রসর হয়েছে পাপকর্মে কলুষিত কোলরিজের বৃদ্ধ নাবিক। আত্মার এই উত্তরণ, পাপের মৃত্যুহিমস্পর্শের মধ্য দিয়ে পুণ্যের, নবজীবনের আবির্ভাব—এইটিই সবচেয়ে মূল্যবান পরিক্রমা। এই পরিক্রমার পাশে দলের উত্তরণ বা মৃতের নবরূপে নবজীবন লাভ তুলনামূলকভাবে গৌনমূল্যে মূল্যবান। এনশেণ্ট মেরিনারে নাবিক নিজের পতন, প্রায়শ্চিত্য ও আংশিক উদ্ধারকাহিনী স্বমুখে বিবৃত করেছে বলে তার মধ্যে অভিজ্ঞতার যে প্রত্যক্ষ যন্ত্রণা পাই তা 'শিশুতীর্থে' অনুপস্থিত। কেননা এই কবিতায় একদিকে শাস্তির অনিবার্যতা নেই, অন্যদিকে 'শিশুতীর্থ' দ্রষ্টা ও নির্লিপ্ত কবির মুখের বর্ণনা। অবশ্য 'শিশুতীর্থ' কবির বর্ণনা না হয়ে উপায় ছিল না, কেননা এনশেণ্ট মেরিনারের মতো কাব্যকেন্দ্রে বিদ্যমান সেই নায়ক এখানে নেই যে তার মর্মঘাতী অভিজ্ঞতার বিবরণ নিজে দিতে পারে। আমি জানি স্বতন্ত্র জীবনবিশ্বাসই দুটি কবিতার মধ্যে এই পার্থক্যের জন্য দায়ী। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মনে হয়, যে-অপরাধীর মুখ অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল সেই হত্যাকারীর কলুষমুক্তির, আত্মার উত্তরণের ইতিহাস 'শিশুতীর্থে'র পরিক্রমার কেন্দ্রে উপস্থিত না করায় 'এনশেণ্ট মেরিনারে'র তুলনায় 'শিশুতীর্থ' দুর্বলতর হয়ে গেছে। একটি কবিতায় অপরাধের ফলে প্রায়শ্চিত্তের অনিবার্যতা, অন্য কবিতায় অনিবার্যতার ধারণার অনুপস্থিতি ; একটিতে ব্যক্তির মুক্তি, অন্যটিতে দলের উদ্ধার ; একটিতে স্বাধীনভাবে নির্বাচিত আভ্যন্তরীণ অনুশোনার দ্বারা উদ্ধারের পথনির্দেশ, অন্যটিতে বাইরের নির্দেশে উদ্ধারের পথে যাত্রা—এইগুলিই কোলরিজের ও রবীন্দ্রনাথের কবিতার মৌলিক পার্থক্য এবং এইগুলিই 'শিশুতীর্থে'র অন্য বহুতর সার্থকতার মধ্যে কেন্দ্রীয় দুর্বলতা বলে আমার বিশ্বাস।

প্রেমের চতুর্দশ পদাবলী

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

সামুদ্রিক সুদূরতা, সুদূরতা অন্তরবাহিরে।
অনঙ্গে এ-অঙ্গ রাখি চৈতন্যের পূর্ণ ফলাধার ;
তুমি যদি হাত রাখ, দেখো আমি জলের ভিতরে
অসংখ্য জলজস্মৃতি হিমস্থির হৃদয়ের ভার।

সে-প্রত্যূষে পাখি গায়, হাওয়া ফেরে পেশল সজীব।
শূন্যমুঠি সূর্যালোক, দিব্যভাতি, পৃথিবীর সবুজ।
আমি দেখো স্মৃতিচারী মহীরুহ, অন্ধকার ক্লীব।
স্রোতস্বিনী তীব্রছায়া সকৌতুক, সান্নিধ্যে গম্বুজ।

সময়ের স্মৃতিভার, প্রেম সেই অরণ্যের মায়া।
অযুত নিগূঢ়কাণ্ড, অসংখ্য বনজ স্নেহলতা।
হাওয়া দেয় সুদূরতা, হাওয়া দেয় সামুদ্রিক হাওয়া!
সময়ের স্রোতবাহে বিচলিত ক্লীবকুশলতা।

সামুদ্রিক সুদূরতা, সুদূরতা অন্তরবাহিরে।
আমি যেই হাত রাখি, তুমি যাও জলের ভিতরে।

যুধিষ্ঠির

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

আমার আসক্তি নেই এই যুদ্ধে, অগ্রজ সঞ্জয়,
রণলিপ্সু প্রতিজ্ঞায় এই ছ্যাখো তপঃক্লিষ্ট দেহ
কেঁপে উঠছে বারংবার ; প্রিয়জন হত, ক্লান্তি ভয়
অথবা রক্তের গন্ধে অন্ধকারে গোপন সন্দেহ
আমাকে, আমার সত্তা ছিঁড়ে ফেলছে দাঁতের করাতে

হিরণ্য গাণ্ডীবধারী পক্ষে আছে অজেয় অক্ষয়!

আমি তবু পুড়ে যাচ্ছি তীক্ষ্ণতর অনুতাপে, পাপে
অশ্বথামা হত যুদ্ধে, অতর্কিত নিষ্ঠুর শায়কে
শান্তির পবিত্র বাণী মুখে নিয়ে, বৈদিক সংলাপে
ভরিয়েছি রণক্ষেত্র, (মূর্খেরাই বারংবার ঠকে!)

আমার দ্বিতীয় সত্তা অন্যতর রণক্ষেত্র ঘিরে।
দ্রৌপদীর প্রেমভিক্ষা করে মরছে আহত শরীরে।

যে আমাদের বাঁচায়

যতীন্দ্রনাথ পাল

দুর্ভিক্ষ বলো, দুর্দিন বলো
তবু একটি স্মৃতি !
যে-রাতে প্রবল হিংসার অন্ধকারে
সমস্ত নক্ষত্র নিবে গিয়ে
কেবল একটি ঘুমন্ত শয়তান
আমাদের বুকের উপরে জেগে ওঠে—
রক্তে ভরে দিতে চায় পবিত্র-প্রান্তর,
শুধুই একটি ঘৃণ্য হানাহানির ইতিহাস
লিখে দিতে চায় বাতাসের বুকে—
কোনোদিন মুছবে না
এমন কলঙ্কিত হরফ,
মানবিকতার কণ্ঠ লজ্জায় দীর্ণ হয়ে যাবে,
ঘৃণায় মুখ ফেরাবে সূর্য
নক্ষত্রের বুক রক্তে ডুবে যাবে
এমন নির্দয়তা যখন
প্রতিবাদে, কখনো কখনো বিবেচনাকে
মুঠোয় পুরে ফেলতে চায়
তখন—হঠাৎ শুনি
অন্ধকারে কার পাহাড়ের মতো

বেদনার বুক ভেঙে দিয়ে
কী সুস্থির পৈশাচিকতা-রোখা বিবেকের গান,
ঘোর অন্ধকার রাত এখান থেকে পালায় :

সে আমাদের হাত ধ'রে
সূর্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহায্য করে,
ঘাসের চোখে তাকাতে আমাদের লজ্জা হয়'না
লজ্জা হয় না আলোয় !

মুখ তোলো প্রেমিক আমার

অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মুখ তোলো প্রেমিক আমার
আর ভয় নেই।

আর্তকণ্ঠের চীৎকারে
ছুটে এলাম।
অন্ধকারে শয়তানটার
চোখ দুটো জল্ জল্ করছিল—
আমাকে দেখেই
আক্রমণ করল,
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে
পেরে উঠল না।
পালিয়েছে
শয়তানটা পালিয়েছে।
(শুনেছি ওর নাকি মৃত্যু নেই
তাই, সুযোগের অপেক্ষায়
ওঁৎ পেতে থাকাই
ওর স্বভাব।)
আর
যাবার আগে
হিংস্র বাঘ-নখগুলো দিয়ে
আমার হৃদয়টাকে
ছিঁড়ে দিয়ে গেল ;
তবু সান্ত্বনা
নারী, তুমি অক্ষত।
(এমন সময় নারী চোখ মেলে চাইল।
এবং তার চোখের আলোকে
সকল অন্ধকার দূর হল।)

ফসলের ঢেউয়ে

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

মানুষকজনা চোখ টানটান করে আকাশটা দেখল।

পুবে পশ্চিমে গহিন কালো। শিমুল গাছের মাথার নীল আকাশটা কখন পাহাড়ের মতো জমে গেল। গাছটার ডালপালাকটা ঘোর হয়ে গেল। ঘুটঘুট্টি আকাশে কিনারা পাওয়া ভার। চাপ চাপ মেঘ গলগল করে গড়িয়ে গেল এ মুড়ো ও মুড়ো।

আর তিন দিন আগেই তেজে চাঁদি ফেটে যাবার হাল। ভর দুপুরটাই কদিন জলছিল দাউদাউ করে। ফাটা ছাঁটা মাঠকটা দেখলে সোমথ চাষীরও বুক হিম হয়ে যেত। বিষে বিষে ঝলসানো ঘাসকটি ধোঁয়াটে মেঘে পাকিয়ে গিছল। মাঝ বেলায় যখন মরা বালি টানতে টানতে হা হা করে ডাইনীর মতো ডাক ছাড়ত বাতাস, তাজা যোয়ান কজনারই ছাতি নড়ত না ডরে। হল্কা হল্কা বিষে জলত মুখচোখ। মস্ত এক শয়তান যেন অঙ্গারের রঙ চুল উড়িয়ে দাপিয়ে বেড়াত সারা গাঁ। আশপাশের জলাকটার জল ফুটত তাড়সে। ঝাঁঝালো গন্ধটায় ম ম করত বাতাস। ঝুপসি গাছকটার পাতা চেটেপুটে আহ্লাদে হি হি করে গাঁময় নেচে বেড়াত রাক্ষুসী হাওয়া।

পরপর দু দুটো ব্যাঙের বে' দিয়েও যখন কিছুই হল না সুদাম চাটুজ্জে চব্বিশ পহরের গাওনা তুলল। ও তাই সই। হঠাৎ মাঝ বেলায় একদিন থমকে গেল গাঁটা। গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসল খানিক। 'ওমা, ই আবার কি গো। তারপরই মেতে গেল মানুষকটার সঙ্গে। চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে নলি ফেড়ে দিল মানুষকটা। চাপ চাপ ধুলোয় কুষ্ঠির কাগজের তুল্য পানসে মেরে গেল রোদের রঙ। ঝাপসা হয়ে গেল চারপাশ। বালি কাদায় চেহারা পাল্টে হ্যাদা গনেশ সেজে গেল সবাই। কত্তাল খঞ্জনীর ডাকে ঘুম-ছুট মানুষজন পিলপিল করে জমল আসরে। হাত ঝাঁকিয়ে বুকে ঝামটা মেরে নাচছিল লোককটা। মাটি কাঁপছিল থিরথির করে। মন্থনের মাঝখানের মেঘের ডাকের মতো গুম গুম বাজছিল খোলটা। ভৈরবের মতো চেহারা হয়ে

গেল সুদাম চাটুজ্জের। দগদগে হলুদ হলুদ জটা উড়ছিল আগুনের পারা। ঝাপসা ধুলোর পেছনে কটা-চোখজোড়া খুঁজছিল কাকে। এখুনি যেন হিড়হিড় করে টেনে আনবে মেঘটাকে। কালো হাত দুটি বাড়িয়ে কি যেন চাইছিল মানুষটা। ধুলোয় ভারভার শেষ বেলায় মাতামাতি বেড়ে গেল আরো। তাল পাকানো শব্দটার গমকে আস্ত গাঁটাই দুলছিল। মধ্যে মধ্যে কটি অবিশ্বাসী চোখ ঠিকরে পড়ছিল আকাশটায়।

কিন্তু চক্কোত্তির বাচ্চাটা বোধহয় প্রথম দেখেছিল। হাত টান করে হেই হেই করে নেচে উঠল—হেই বাবা। দেখ গো দেখ। হুই···যে।

তাই ত গো। সুধন খালির মৌজার পাশে খানিক খানিক মেঘ ল্যাপটানো যেন। কটা আধ-জাগা তারাকে গিলে ছায়ার মতো ভাসছিল। পড়ে পড়ে মুড়োটা হেলিয়ে দুলিয়ে পথ খুঁজছিল যেন। কোন্ দিকে যাই গো। কোন্ পানে বাজছে ডাকটা। এই এ্যাতটুকুন এক ফালি। বিশ্বাস হয় না। তেলোর পিঠে চোখের কাদা মুছে বারবার দেখছিল লোককজনা। মেজাজে গলা চেপে গেল সবারই। ধূলায় ধূলায় মাখামাখি মানুষকটা চাপচাপ ছায়ার মতো দুলছিল। ঝমঝম করে বাজছিল অন্ধকারটা। মরদ যোয়ানকটি চ্যাচাচ্ছিল বুক কাঁপিয়ে। দাপটে সারা গাঁটাই ছাতি দুলিয়ে দুলিয়ে মেতে গেল তখন। মধ্যে মধ্যে সব দেখছিল মেঘটুকু। কে জানে বাবা বাতাসের এক পাখসাপটানিতে টেনে নিয়ে না পালায়। ও মা তাই কি হয় কখনো। সেই যে কথায়ই বলে আষাঢ়ের ডাক আর খোলের হাঁক। পুরান বাক্যি বাবা। ওর আর নড়চড় নাই।

সেই মেঘ ছড়াল। যেন কোনখান থেকে আঁচল টাঁচল উড়িয়ে ছুটে এল। গুমগুম করে হেঁকে বলে উঠল আর পারি না বাপু। এট্টু জায়গা-টায়গা দাও দিকিনি। ছিল এক ফোঁটা। এখন এ আকাশ সে আকাশ। কটা কটা রঙটা ফুলতে ফুলতে কখন মিশে গেল অন্ধকারে। চওড়া চ্যাটালো শরীর মেলে হাত পা টান করে থম মেরে গেল আকাশটার পিঠে। মস্ত পাঁজরা ফাটিয়ে গমগম করে ডাক ছাড়ল হটাৎ। পব্বোতের মতো শক্ত কাছিমের খোলটার ওপর জোরে জোরে কে যেন বাড়ি মারল কটা। চটাস করে ফেটে গেল মাঝখানটা। শিঁক করে পাতলা কঞ্চির মতো চিরে গেল অন্ধকার।

গুমগুম করে খোল বাজছিল। ধূলায় ধূলায় কালোকালো লোককজন।

কিন্নুর পুঁচকে ছেলাটা ঘুমসি থামচে হাঁপাচ্ছিল ফঁস ফঁস করে। গদ্দানটি টলছিল মৌজে। চোখ বড় বড় করে শ্বাস ফেলছিল টেনেটেনে। যেন কোন্ রাজ্যি থেকে পিঠে করে এনে ধপাস করে মানুষকটার সামনে ফেলে দিল মেঘটা—নাও। নাও গো ধর এইবার।

কিন্তু চক্কোত্তি হাড়-টানা ছাতিটাই মেলে দিল দেমাকে। চকচক করে খুশিতে জলছিল কপাল। তারই ছেলাটা প্রথম সংবাদটি দিল সব্বাইকে। মূল গায়েন সুদাম চাটুজ্জে সমীহ করছিল মানুষটাকে। সে কি আর বাবা যে সে লোক। কাদা গিলে ফেলেছিল খানিকটা। থুকথুক করে তাই ফেলতে ফেলতে বলল—হুঁ বাবা। খোলের হাঁক আর আষাঢ়ের ডাক পিঠে পিঠে। তা যাতই ত্যানানা কর না। শেষটায় আসতি বাধ্য।

মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে সায় দিল লোকটা।

ওই বিষ্টিতেই চান সেরে ঘরে ফিরবে সব। না-চান না-খাওয়া মানুষ কটির মুখচোখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গিছল। মাতালের মতো নাচ আর ধুলোট। আর এক রাশ ধুলো ছিটিয়ে দিল কারা। রঙ মরে গেল টিমটিমে লণ্ঠনকটার। আর-এক চোট কাদা মাখল সব। বসে বসে হাঁপাচ্ছিল চোখ টেনে টেনে দেখল আকাশটিকে। কে যেন এ-মাথায় সে-মাথায় ভুষো সাপটে দিল এই মাত্তর। এইয়া এক খ্যাপা হাতি যেন গরবে গরবে শরীর দুলিয়ে ফুলিয়ে স্থির হয়ে গেল কখন। গুম গুম করে মেঘ গর্জন করল কবার। মানুষজনার বুকে বুঝি বাদ্যি বাজল দুম দুম করে।

থম থম করছিল তাবৎ আকাশটি। ঢল নামা ঝুলি কালি মেঘটুকু চাপ চাপ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাজ ফাটল। চটাস করে এক টানে চিরে গেল মেঘ। ইদিক সিদিক জ্বলে গেল আকাশ। আবার চাপ চাপ মাজা মাজা। গুড় গুড় করে হাঁক পাড়ল মেঘ। মস্ত যোয়ানটা যেন তাল গাছের মতো থাবা তুলে বুক চাপড়াল বারকয়। ফালা ফালা হয়ে গেল কালি কালি জমাট পাঁজরাকটা।

তারপরই বিষ্টি। গল গল করে যেন হটাৎ গলে যাচ্ছিল অন্ধকারটি। ঠাণ্ডা ঢেউ তুলে নাচছিল চারপাশে। স্রোতে ভেসে গেল সব শরীর। সুদাম চাটুজ্জের কালো পাথর কপালটায় বিষ্টির ফোঁটা জমল। কটা শাদা তারা ফুটে রয়েছে। কপালের সিঁদুরটা গলে গিয়ে লাল দাগটি

এঁকেবেঁকে চিবুক ছুঁয়েছিল। যেন বিদ্যুতের মতো কখন ফেটে গেল কপালটা। কাপড়ে মালসাট মেরে দাপাদাপি জুড়ে দিল সব। ঝুপসি বটগাছের পাতা ডাল বাজছিল ঝমঝম ঝমঝম করে। গিঁথে গিঁথে পাঁজরায় বসে যাচ্ছিল শব্দটা। নেশা পাক মারছিল মাথার মধ্যে। জল গড়াচ্ছিল হাতে পায়। ননীর মতো নরম কাদা গলে যাচ্ছিল। নিচের জমিটা কাদা কাদা। দাঁড়ানো দায়। টলমল করছিল শরীর। কে একটা লাফ দিতে যেয়ে ঢলে গেল কাদায়। কাদা গিলে ল্যাবাগোবা মুখ করে হাসল হি হি।

মাঝ রাত্তিরে বুঝি দাপট বেড়ে গেল আকাশটার। বাপস। গাঁক গাঁক করে ক্ষ্যাপা বাউণ্ডুলের মতো নাচ সুরু করে দিলে। গাছকটা একসঙ্গে কেশর ফাঁপিয়ে ফুঁসছিল আক্রোশে। ডাঁই করা অন্ধকারটি চটাস চটাস ফেটে যাচ্ছিল। শাপের জিভের মতো আগুন এমুড়ো সেমুড়ো জ্বালিয়ে হিলহিল করে নাচছিল। বুক ছিঁড়ে হা-হা হাসছিল অন্ধকার। থাবা ঠুকতে ঠুকতে মাটি টলছিল। বাতাস ছুটছিল সাঁই সাঁই করে। কার টিনের চালটা ফটাং ফটাং করে রাগে ঝাপটা মারছিল। আষ্টেপিষ্টে শেকল বাঁধা কোনো দত্যি শরীর ঝাঁকাচ্ছিল। বাজছিল শেকলকটা।

বছরুদ্দির বুকটা হিম মেরে গেল। বউ আর কোলেরটা উঠে বসেছিল কখন। থেকে থেকে ঝাঁকি মারছিল চালটা। সামনে ন্যাড়া বেলগাছ চিরে বুক কাঁপানো বাজ পড়ল একটা। ঝলসে গেল আকাশ। বছরুদ্দির কলজেটা পানির মতো ডরে জমে গেল।

—বউ গতিকটি সুবিধার নয়রে। না জানি কি হয় ইবারডায়। ঝড়ের গাঙ্গানি তো শোনছিস কানে ?

বউ জবাব দেবে কি। মুখ শুকিয়ে এ্যাতটুকুন। চোখ দুটা যেন পাথর হয়ে গেল তরাসে। ছেনাটার মুখ বুকে ঠেসে ধরে ভগমানের নাম নিচ্ছিল। গলাটা খাঁ খাঁ করছিল শুকিয়ে।

ঝড় নাচছিল হা-হা করে। ঠকাস ঠকাস বাজছিল বাঁশ ঝাড়কটা। ঢ্যাঙ্গা তালগাছগুলো মাড়িয়ে হাওয়া নাচছিল। নাগ বাসুকীর মত্ত ফণার মতো দুলছিল মেঘ। পাগলা মাটি নাচছিল। গর্জন করছিল লড়ুয়ে ষাঁড়ের তুল্য। আর তার মধ্যি ঝপাস করে একটা শব্দ ফুটে উঠেই ধ্বসে গেল অন্ধকারে।

—গেল গো। গেল কার চালডা। ফিসফিস করল বছরুদ্দি।

পাশের শরীরটা কাঠ হয়েছিল। রা কাটছিল না মুখে। তীরের মতো ছাট উড়ছিল বাইরে। শব্দটা হাহাকার তুলে বসে যাচ্ছিল পাঁজরায়। তেঁতুলগাছকটা কাটা ধড়ের তুল্য ঝটপট করছিল গোঙাতে গোঙাতে।

অবস্থাটি ঠাহর করা গেল ভোরের বেলায়। আকাশ তখন ঝিম মেরে উত্তুরে সরছিল অল্প অল্প। লণ্ডভণ্ড সারা গাঁটাই। মানুষজনা এর তার দাওয়ায় উঠে সব্বোনেশে অবস্থাটা দেখছিল ঘুরে ঘুরে। অবাক হয়ে ভাবছিল। ই কি কাণ্ড বল দিকি নি বাপু। এঁ্যা। চুকচুক শব্দ করছিল মুখ দিয়ে। উঠানময় কাঠকুটো পাতা ডাঁই করা। দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেল যেন। দু দণ্ড ঝড়েই এই ব্যাপার। বছরুদ্দির দাওয়ায় প্যাটা পোটা গলা একটা ব্যাঙ পড়েছিল পেট উপুড় করে। সে কাঠি দিয়ে সরাতে সরাতে শুনতে পেল শিবু চক্কোত্তি কাকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল—বুজলে কিনা মোড়ল। গতিকটি বেশ সুবিধের নয় বাপু।

—কেনে কত্তা।

—গন্ধেশ্বরীর এই বাগের আড়টা সাফসুফ। ড্যাঙ্গার জমিতেই হাঁটু মাপা জল উঠেছে। আরো বাড়বে মন হয়।

বাড়ল বই কি জল। শেষ বেলায় সানকিতে চারটি মুড়ি নিয়ে বসেছিল বছরুদ্দি। কলকল কলকল করে জল ঢুকল দাওয়ায়। এক ঝটকায় তক্তাতে উঠে এল মানুষটা।

—আয় আয় বউ। উঠে আয় গো।

একটা ঘোলা ঢেউ ঝামটা মেরে ফিরে গেল সেদিকটায়। পাঙাশ ঢল নামা আকাশটা দেখলে ধ্বক্ করে ওঠে বুক। সমস্ত রাত মাতামাতির পর বাসুকী যেন ফনাটা ছড়িয়ে ঝিম মেরে পড়েছিল খানিক। খলখল করে পানি নাচছিল দাওয়ায়। কেমন এক রকম ফ্যাকাশে রঙ ফুটছিল চারপাশে। ঢেউগুলি আন্ধারে মাতামাতি করছিল। তক্কে তক্কে ঘুরছিল যেন। এক্ষুণি সব চেটেপুটে ছুট দেবে গাঙ্গের পানে। কটা মরা আরশুলা সামনেটা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে মুছে গেল বাঁকটায়। মানুষকটার বুকমুখ শিটিয়ে এইটুকখানি। উড়ো খড়কুটো খসে পড়ছিল টুপটুপ করে। এঘর সেঘর ডুবিয়ে জল নাচছিল সব্বোনাশীর মতো। হাটের ঘাটের ফারাক নাই। তেঁতুল শিমুল গাছকটা একবুক জলে ন্যাতানো ডালপালা মেলে ধুঁকছিল পড়ে

...রে। গন্ধেশ্বরীর গোঙানীর ডাকে হাত পা জমে যাচ্ছিল সবার। কুলকুল ...ওা টানটায় শিরশির করছিল রক্ত।

ইদিকে বেলা পার হয়ে এল কখন। ক্ষরিশ ফনাটা কালো পাথরের তুল্য ...র হয়ে গেল এক সময়। যেন নিজের কাণ্ডটা দেখে নিজেই জমে গেল ...াসে। চালায় বসে থাকা মানুষকটার মুখ ফ্যাকাশে বনে গেল মড়ার মতো। ...র নজর তক্ খালি জল আর জল। ঘোলা ঘোলা ঢেউকটি খিলখিল হাসছিল ...য়ালে। মনসাতলার ঘূর্ণিটার গর্জনে বুক কাঁপছিল সবারই। কেবল ...াগলীর মতো ঢেউ নাচছিল ঘরে উঠানে।

...লি পড়েছিল মাঠে। বামনা হাঁসখালি সোনাডগরার ঘাট মাঠ ছেয়ে ...েথক করছিল নরম কালো কালো মাটি। দূরে দূরে জল ভেঙে তাজা ...ক্কা মুখের মতো মাটি জাগছিল। পুবে তখন চাপ চাপ অন্ধকার ফাটিয়ে ...াশির মতো এত্তো বড় সুয্যি উঠছিল। কুঁকড়ার ঝুঁটির পারা কচি কচি ...াল রঙ। ভেসে গেল মাঠকটা। গলা সিঁদুরের মতো ঢল ঢল করছিল ...াটি। জল নামাতে কোন্ ভোর রাতেই কটা শালিখ মাঠে নেমে এসেছিল। ...টপুট করে মাটি মাখছিল পালকে।

—দেখ দিকি নি পক্ষীর প্রাণ। তাই টের পেয়ে গেছে বেপদ আর নাই। তামুক টানছিল শ্রীনাথ। একমুখ ধোঁয়া বার করে বলে উঠল নিজের মনেই।

—তা যা কয়েছ ছেনাথ। ই তিনদিন কি হুঁস ছেল কারু। এঁ্যা?

খুক খুক করে কাশল শ্রীনাথ। সামনের আল মাড়িয়ে একটা ছায়া পার হচ্ছিল তখন। হেঁকে উঠল শ্রীনাথ—কে গো, মিঞাসাব না কি। আস আস তামুক খায়ে যাও।

—যাই গো। যা তিনদিন ধরি বাপস। গলাটা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল বছরুদ্দি—কুন অমঙ্গল হয় নাই তো মোড়ল।

—না গো জোর বাঁচি গেলাম ইবারডা। আবার একবুক ধোঁয়া ছাড়ল শ্রীনাথ।

সুয্যির রঙটি গনগনে হয়ে উঠেছিল। কালো মাটির ওপর শালিখের পায়ের ছাপ পড়েছিল। চক্কোর খেতে খেতে এ-মাঠ সে-মাঠ পার হয়ে ...াগটা মিশে গিছল কোথায়। বলদকটা ইদিক সিদিক ঘাস খুঁজছিল শুধু শুধু।

কাদা ল্যাপটানো ক্ষুর ঝামটাচ্ছিল থেকে থেকে। ফতফত করে কটা উচ্চিঙ্গে লাফ দিয়ে বেড়াচ্ছিল চারপাশে। বছরুদ্দির রগের পাশটায় সেঁটে গেল একটা। ঝাড়তে ঝাড়তে বলল—কাশী ছুতারের চালডা আর বাঁচল নি ইবার।

—ও মা তাই বুঝি।

—হঁ। বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলল বছরুদ্দি।

সকালের মেলাই রোদে জেগে উঠল মাঠকটা। সোমথ মেয়ের মতো বাড়বাড়ন্ত ভারভার শরীর। তাজা টসটসে বুকে তাত মিশে গেল চারপাশে। নরম মাটির ওপর আঙুল নামালে বসে যাচ্ছিল সরসর করে। একটা ভেজা ভেজা গন্ধ টাল খাচ্ছিল বাতাসে। টেনে টেনে শ্বাস নিল চাষীকটা। ভরাট বুকগুলি ভেসে যাচ্ছিল রোদ্দুরে। মাঠ তো নয় যেমন ক্ষিরের সাগর একখানা। হায় গো। পা না বসাতেই ভুস ভুস করে বসে গেল হাঁটু পর্যন্ত। লক্ষীমন্ত সেই মাটি। নরম ভাপে শিরশির করছিল পায়ের পাতা। যোয়ান বলদকটাও পাহাড়ের মতো পাঁজরা ফুলিয়ে গন্ধ টানছিল। হটাৎ থমকে কালো কালো চোখ ভাসিয়ে কি যেন খুঁজছিল চারপাশে।

চমকাল শ্রীনাথ। এতক্ষণ খেয়ালই করে নি। সামনের ঝোপঝোপ অশথ ডালটায় কটা শকুনি বসেছিল। বুকটা টানটান করে কাঠকাঠ ডানাকটা খসখস করে ঝাপটাল কবার। ব্যাঁকানো লম্বা গলাটা বাড়িয়ে প্যাটপ্যাট করে দেখছিল কোনদিকে।

—রাম রাম।

থিরথির করে কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি মুঠোয় লাঙ্গলের ফলাটা খামচে ধরে ল্যাজ মলে দিল বলদটার। ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছিল মাটি। ঝুর ঝুর করে ভেঙ্গে যাচ্ছিল নরম কাঁচা মাটি।

—দেখলে না কি মিঞাসাব। ফিসফিস করল শ্রীনাথ।

—জন্তুটন্তু পঁচছে কুথাও। গোড়ালি দিয়ে একটা চাপ ঢ্যালা ভাঙতে ভাঙতে বলল বছরুদ্দি।

শ্রীনাথের বুকটা তখনও কাঁপছিল ভয়ে। ঘাড়টা অন্যদিকে গুঁজড়ে লাঙ্গল ঠেলতে লাগল। তীরের মতো ছুটছিল ফলাটা। ঝুরঝুর ঝুরঝুর করে ভেঙে যাচ্ছিল মাটি।

ইদ্দিকে মাথায় উঠেছিল সুয্যি। পায়ের নিচের মাটি তেতে উঠেছিল

...র অল্প। হাঁটুর নিচ থেকে কাদার দাগটা শক্ত হয়ে চাপ বেঁধে ...ছিল। টানের চোটে খানিক খানিক কাদার চাপ নাকে মুখে ছিটকে ...েছিল। টিপের মতো জেবড়ে চাপ হয়ে আটকেছিল সেইখানেই। ঘামে ...ামে মাজা মাজা হাত-পা-মাজা-উরু জলছিল তাতে। বালি বিজবিজ করছিল ...কে পিঠে। ঘাম শুকিয়ে চটচট করছিল মুখের চামড়া। আর কটা পাক ...িয়ে খানিক বসবে ভাবছিল শ্রীনাথ। হটাৎ পুবের আল ঘেঁষে চাপ হয়ে বসে ...গেল ফলাটা। না নড়ন না চড়ন।

বাপরে যেন পাথরে কামড় বসিয়েছিল। একেবারে জমে গেল ফলাটা। ...নড়ান চড়ান দায়। হাত পায়ের ডিম কটা চাগড়া চাগড়া হয়ে ফেটে উঠল ...শ্রীনাথের। তিলকের মতো টানটান হয়ে কেটে বসে গেল কপালের শিরাটা। ...তবু নড়ল না লাঙ্গলটা।

—ও মিঞা।

—দ্যাও দ্যাও। চাপ দ্যাও আরো।

কালো কপালটার চামড়ায় ভাঁজ পড়ল কটা। চওড়া ছাতিটা ঠেলে বার ...হয়ে এল খানিক। পাঁজরাকটা চামড়া ছিঁড়ে বার হয়ে এল একটা একটা। ...আর একটানে চাবড়ার মতো ছিটকে গেল একতাল মাটি।

—ই কি গো মোড়ল!

লাঙ্গলটাঙ্গল ছেড়ে ঝুঁকে পড়ল বছরুদ্দি। ধ্বক করে উঠল শ্রীনাথের ...বুকের মধ্যিখানটা। কোলের বাচ্চা একটা। চাপে চেপটে তাল পাকিয়ে ...গিছল কাদার সঙ্গে। গলাগলা একটা পাশ। কটু গন্ধ উঠে এল ভক ...করে। ঘিনঘিন করছিল বুকটা। হ্যাকাহাবার মতো চেয়ে চেয়ে দেখছিল ...চাষীকটা।

...দিন কয় বাদেই পরবের ঢাকে কাঠি নাচবে নাকুড় চাকুড় এস ঠাকুর ...করে। মাথার ওপর মাজা প্রতিমার মতন ঢলঢল করছিল আকাশ। নতুন ...চরের মতন ফুটেছিল কটা কুচোকাচা মেঘ। রাত্তিরে বিষ্টি পড়েছিল ...কফোঁটা। জমিগুলা যেমন জলছিল আন্ধারে। ধানের আগায় চিকমিক ...করছিল বিষ্টির জল। কপালে কাচা-পোকা টিপের মতো টিপ টিপ নাচছিল। ...পলকে পলকে পাল্টাচ্ছিল রঙটা। এক খামচা ধানের পিঠে কস্তে ঘষছিল ...শ্রীনাথ, মুখটা তুলল টানটান করে।

—ধানের গড়নখান দেখছ মিঞা।

—তা যা কয়েছ বাপু। শিষ তো লয়। আহা। একএকখান আঙ্গুল যেমন।

—ত্যাখ না। মাটির উপরই কাৎ করে দিল না ডগাকটা।

কাটা ধানের গাদায় পা ডুবিয়ে ক্ষেতকটা দেখল মানুষটা। ধান আর ধান আর ধান। সেই…ই দূরে তাকাও না। ধান আর ধান আর ধান। আলের পাড় ঘেঁষে একটা কাঠবিড়াল থরথর করে পার হচ্ছিল। খানিক থমকে পিটপিট দেখল মানুষটাকে। হাবাহাবা চোখ পাকিয়ে ভাবল। হায় হায়। এত্তো। এত্তো ধান উঠল এবার। হলুদ হলুদ মাঠকটা। পুরুষ্টু খোলামেলা আহ্বরে গা মেলে ঢলছিল অল্প অল্প। ভাসছিল আলোয় আলোয়।

কটা শঙ্খচিল পাক খাচ্ছিল ঠিক মাথার উপরটায়। অবিকল শাম্পান যেন। পাতলা পাতলা হাওয়ায় টাল খেতে খেতে পরবাস থেকে ফিরছিল। বুকের উপরটায় চকখড়ির রঙটা ফুটছিল বাদামের মতো।

ইদিকে সূয্যি পায়ে পায়ে সোজা উঠে এল। রঙিলা আকাশটার রঙ ঘোর হয়ে গেল। উঠতি বয়সের মতো দানা বাঁধল কখন। আর সবে বিয়োনো গরুর মতো ভারভার মাঠকটা। গতর মেলে ঝিমোচ্ছিল গরবে। কুঁজো থেকে থেকে শ্রীনাথের শিরদাঁড়ার তলাটা টনটন করছিল। পিঠটা ভেঙ্গে সিধা উল্টা দিকে গা ভেঙ্গে হাত দুটা টানটান করে সপাটে ছুঁড়ে দিল আকাশে। ডাঁটো কলার কাঁদির তুল্য কেটে কেটে উঠল পাঁজরগুলা। চিকন কপালের মতো কাস্তের ফালিটা দাঁত মেলে দিল হেসে। গলগল করে ঘাম গড়াচ্ছিল সর্বাঙ্গে।

বছরুদ্দি উবু গেড়ে একটা বড় মাটির চ্যালায় কাস্তের বাঁটটা ঠুকছিল। সামনের আলে দেখা গেল মেয়েকে।

—আমানি গো…ও…ও…

শরশর শরশর শব্দ তুলে উল্টিপাল্টি খাচ্ছিল ধানের শিষকটা। এরওর গায়ে ঝামটা মারছিল সোহাগীর মতো। শব্দ ছাপিয়ে হেঁকে উঠল শ্রীনাথ—নক্ষী নাকি রে। তেঁতুল তলাটায় জিরো খানিক। আমি এলাম বলে।

খানিক বাদেই উঠে এল মানুষকটা। তেঁতুল গাছটার ঘন ছায়ায় পিঠ রেখে ঘামচিটে গামছা দিয়ে ঘষছিল ঘাড়গদ্দান। তেঁতুল গাছটি যেন

[..]ই কতকালের কত্তা কত্তা পুরুষ একটা। অনেক দেখেছে। অ—নেক [..]নেছে জীবনভর। গাঁয়ের মুখেই চওড়া বুক ছড়িয়ে ঝড় আটকেছে। [..]ক্ষুসী নদীকে থামাতে না পেরে হ্যাতানো ডালপালা ঝাঁকিয়ে কেঁদেছে [..]টুপাটু। গুঁড়ির নিচের বাঁধানো শানটায় মঙ্গলচণ্ডীর ভাঙ্গা চ্যাপটা [মূ]র্তিকটা আগলেছে আঁচল বাড়িয়ে। বানের টানে মাটি খেয়ে নিল [ক]তবার। তবু কাৎ হয় নাই। সব দাপট পার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শক্ত [শ]রীর মেলে।

টক্‌চা গন্ধ উঠছিল একটা। জলের মধ্যে ভাতকটা ফুলে গিছল। কড়ির [দা]না যেন একএকটা। আমানির গন্ধটায় খাঁ খাঁ বুকটাও ভরাট হয়ে যাচ্ছিল। ঠোঁটের চামড়ায় নুন জমেছিল পুরু হয়ে। চটচট করছিল মুখচোখ। থরথরে শক্ত ঠোঁটটা জিভ দিয়ে চাটছিল বছরুদ্দি। বলল—তা মোড়ল মেয়াটার বন্দবস্ত কর দিকি নি এবারডা। ফলন তো মন্দ হয় নাই।

সামনের চটলা ফাটা শানটায় বসেছিল মেয়ে। মুখটা লাল পারা হয়ে গেল খানিক খানিক। কটা কটা চুল কখানি টুকুন ঘামের সঙ্গে লেপটে ছিল কপালে। চোখ ভরে দেখল শ্রীনাথ। মনে হল ঘামতেল মাজা মাজা [জ্য]ান্ত লক্ষী একখানা। জোর জোর করে ঘাড় বাঁকাল কবার।

—নিচ্চয় নিচ্চয়। ত্যাই আবার বলতে। একখান ডাগরডোগর পাত্তর [দ]েখ দিকি নি মিঞা।

খানিক কি ভেবে নিয়ে দুষ্টুর মতো হেসে উঠল বছরুদ্দি।

—ও মেয়া দেখ দিকি বাপু। সাজলে গোজলে আমারে মনে ধরে কি না।

আর ফিক্ করে মেয়ে হেসে উঠে ছুটল খেতে খেতে। ধানের ডগার মতন দুলে দুলে। হাওয়ার মতন উড়তে উড়তে।

গণতন্ত্রের ভিত্তি

প্রদ্যোৎ গুহ

গণতন্ত্র কি ? গণতন্ত্র কি কোনো শাশ্বত আদর্শ—প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের মতো বাস্তব যার ত্রুটিপূর্ণ প্রতিলিপি মাত্র ? গণতন্ত্রের কি কোনো নিজস্ব মূল্য আছে ? গণতন্ত্রের ভিত্তি কি ? আর্থনীতিক না আধ্যাত্মিক ? এসব প্রশ্ন যে আজকের দিনে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের আলোড়িত করছে একে সুলক্ষণই বলতে হবে। আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের প্রাগ্রসর অংশ যদিও উনবিংশ শতাব্দীতেই গণতন্ত্রের আদর্শকে বরণ করে নিয়েছিলেন, শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন মিল-বেন্থাম কি টম পেইনের—কিন্তু তাঁদের পক্ষে এই আদর্শের চর্চা তখন নিছক বুদ্ধির চর্চা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদেরও যে ইতিহাসের অমোঘ বিধানে একদিন এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে—সেদিন তাঁদের কজন তা ভাবতে পেরেছিলেন ? আর পরাধীন দেশের মাটিতে গণতন্ত্রের ফসল যে ফলে না—একথা তো প্রায় সর্বজনস্বীকৃত।

গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা আমাদের মাত্র এক যুগের। গণতন্ত্রই মানবসভ্যতার অগ্রগতির শেষ কথা কিনা তা নিয়ে যতই বিবাদ থাক—একথা তো আর মিথ্যে নয় যে পরাধীনতা হতে স্বাধীনতা, স্বৈরশাসন হতে গণতন্ত্রে উৎক্রান্তি মানবসমাজের অগ্রগতিরই সূচক। তাই গণতন্ত্র নিয়ে আমাদের মাতামাতিটা যদি মাত্রা ছাড়িয়েও যায় তাতে দোষ দেখি না। পরাধীনতাজনিত অগণতান্ত্রিক অভ্যাসের জড় আমাদের মধ্যে এখনও এত পরিমাণে আছে যে এতে বরং সুফল ফলবারই সম্ভাবনা।

অবশ্য গণতন্ত্র নিয়ে এ ধরনের আলোচনা নতুন কিছু নয়। এক শতাব্দী আগেই ইয়োরোপ ভূখণ্ডে এ-সব প্রশ্ন উঠেছিল এবং এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কও কম হয় নি। বরং এ-সব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা এত হয়েছে যে নতুন করে তার অবতারণা করতে গেলে পুরোন কথা অনেকখানি এসে পড়বেই। তবু এ আলোচনা নিরর্থক বলা যায় না। মানুষের ইতিহাস থেমে থাকে না—

অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়ে, জ্ঞানের সীমানা প্রসারিত হয়—পুরোন যুক্তি-তর্ক, তথ্য ও নজিরকে নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে যাচাই করে দেখতে হয় তার কতটুকু সত্য আর কতটুকুর স্থান ইতিহাসের আবর্জনা স্তূপে। তাছাড়া পুরোন প্রশ্নও ধরে নতুন রূপ—তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে প্রয়োজন হয় নতুন যুক্তির।

ইতিহাসের দিকে তাকালেই এই বক্তব্যের যাথার্থ্য বোঝা যাবে। এক শতাব্দী আগে যখন এই আলোচনা প্রবল হয়েছিল ইওরোপ ভূখণ্ডে তখন বুর্জোয়া-বিপ্লবের জয়পতাকা উড়ছে। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছে তারও আগে। যাঁদের বলা হয় বুর্জোয়া-বিপ্লবের মন্ত্রগুরু সেই ফরাসী বস্তুবাদী দার্শনিকেরা সামন্ততান্ত্রিক ভাবাদর্শের অচলায়তনের ভিত্তি চূর্ণ করে দিয়ে মানুষের মনকে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করে তুলছেন। তাঁরা মানেন নি কোনো বাইরেকার কর্তৃত্বের শাসন। ধর্ম, প্রকৃতি, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে নির্মম সমালোচনার কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন। অতীতের সমাজ, অতীতের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও ধ্যান ধারণাকে অযৌক্তিক এবং অন্যায্য বিবেচনা করে নিক্ষেপ করতে চেয়েছেন আবর্জনা স্তূপে। তখন, পুরোন সমাজ-ব্যবস্থা, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রই বরং শাশ্বত সত্যের ধোঁয়াটে বুলি কপচে আত্মরক্ষার প্রয়াস পেয়েছে।

তারপর অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে বুর্জোয়ারা আর ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভূত হয়েছে শ্রমিক শ্রেণী—মার্কস যাঁদের বলেছেন, পুঁজিবাদের গোরকুণের (Grave diggers) দল। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংকটে দীর্ণ পুঁজিবাদের অস্তিত্ব বিপন্ন—এসেছে নতুন আর এক ক্রান্তিকাল। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বুর্জোয়া শ্রেণী স্বভাবতই এখন হয়ে পড়েছে রক্ষণশীল। যুক্তির তরবারি একদিন যাঁরা তুলে নিয়েছিলেন আজ তাঁরাই আন্দোলিত করছেন ভক্তির পতাকা। এরই নাম হয়তো ইতিহাসের পরিহাস !

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে মার্কস সবে যখন তাঁর বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের তত্ত্ব ব্যাখ্যান করেছেন তখন তাঁর মতবাদকে খ্যাপাটে লোকের পাগলামী বলে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়তো সম্ভব ছিল। কিন্তু আজ পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে মার্কসকল্পিত সমাজের গোড়াপত্তন হয়েছে। আর তার সাফল্যের হিসাবও নিতান্ত নগণ্য নয়। সমাজবাদী রাষ্ট্রের চল্লিশ

বছরের অভিজ্ঞতা আজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অঙ্গীভূত। গণতন্ত্র সম্পর্কে যে কোনো আলোচনায় আজকের দিনে তাই স্বাভাবিকভাবেই সমাজবাদী রাষ্ট্রের তুলনা এসে পড়ে। আজকের দিনে তাই এ-ধরনের আলোচনা অনেকখানি তথ্য-নির্ভর হতে পারে।

অবশ্য এ-কথা স্বীকার্য, এ-ধরনের আলোচনা সব সময় তবু তথ্য-নির্ভর হয় না। না হবার একটা কারণ হয়তো এই যে, এ-আলোচনার সবটাই সত্যে পৌছুবার নিষ্কাম প্রেরণাসঞ্জাত নয়। যাঁরা পণ্ডিতিচালে গণতান্ত্রিক আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে বসেন তাঁদের কারু কারুর যে পাঞ্জাবীর নিচে ঠাণ্ডা লড়াকুর বর্ম-চর্ম লুকোন নেই—এমন কথাও হয়তো হলফ করে বলা যায় না। আর এ-ও দেখা গেছে অত্যন্ত বোধগম্য কারণেই প্রায়শ এঁরা আসল প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে কুতর্কে বিষয়টিকে ঘোলাটে করে তুলতে চান। কিংবা, কতগুলি স্বকপোলকল্পিত সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়িয়ে এমনভাবে যুক্তি বিস্তার করতে থাকেন যেন সেগুলি প্রমাণিত বা প্রমাণযোগ্য সত্য। একটা উদাহরণ দিলে বোধ হয় কথাটা পরিষ্কার হবে। হামেশাই দেখা যায়, ইঙ্গ-মার্কিন রাষ্ট্রনায়কেরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে তাদের যে বিরোধ তাকে চিত্রিত করেন গণতন্ত্র বনাম কমিউনিজমের বিরোধ রূপে। এই বিরোধের কারণ কি বর্তমান প্রবন্ধের তা আলোচ্য নয়—এইখানে শুধু এই কথাটা বললেই চলবে যে, গণতন্ত্র এবং কমিউনিজমকে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে চিত্রিত করা যায় না। গণতন্ত্র একটা রাষ্ট্রব্যবস্থা (form of state) আর কমিউনিজম একটা সমাজব্যবস্থা (form of society)। কমিউনিজমের বিপরীত পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র নয়। এই মামুলী কথাটা ইঙ্গ-মার্কিন রাষ্ট্রনায়কদের বা যাঁরা তাঁদের প্রতিধ্বনি করেন তাঁদের না-জানার কথা নয়। হয়তো তাঁরা ইচ্ছে করেই এই ধরনের বিকল্প রচনা করেন (কেননা প্রকাশ্যে পুঁজিবাদের পক্ষে সমর্থনের লোক খুঁজে পাওয়া আজকের দিনে দুষ্কর) এবং বারবার তা আওড়াতে থাকেন।

ফ্যাশিস্ত প্রচার পদ্ধতির একটা মূল প্রস্থান এই ছিল যে একই মিথ্যার বারংবার পুনরুক্তিতে তা ক্রমশ সত্য হয়ে ওঠে। ধরন-ধারন দেখে মনে হয়, তাঁরাও বিশ্বাস করেন যে, অপ্রমাণিত বা অপ্রমাণযোগ্য সিদ্ধান্তের পৌনঃপুনিক পুনরুক্তিতে তা স্বতঃসিদ্ধের পর্যায়ে উন্নীত হয়।

এ-পদ্ধতিকে আশু ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা যে আছে তা অস্বীকার করা যায়

না। বলতে কি, এ-সব প্রচার কোনো কোনো মহলে বেশ খানিকটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেও। তবু, ফ্যাশিজমের দৃষ্টান্ত দেখিয়েই বলা যায় যে, এই পদ্ধতি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে থাকে।

দুই

গণতন্ত্র কি? এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া সহজ নয়। কয়েকবছর আগে গণতন্ত্রের একটা যুক্তিসঙ্গত সংজ্ঞা নিরূপণের উদ্দেশ্যে 'উনেস্কো'র উদ্যোগে পণ্ডিত-সম্মেলন বসেছিল। কিন্তু বিস্তর আলোচনার পর সম্মেলনে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত হল যে, অধিকাংশ লোক যদিও আদর্শ হিসাবে "গণতন্ত্র" গ্রহণ করার পক্ষপাতী তবু গণতন্ত্রের চেহারা, চরিত্র এবং মর্মার্থ যে কি সে সম্পর্কে কোনো সর্বজনস্বীকৃত সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়।

মতভেদ অবশ্য স্বাভাবিক। গণতন্ত্র বস্তুটি জল-মাটি-পাহাড়ের মতো ধরা-ছোঁয়া-অনুভব করা যায় না। গণতন্ত্রের ধারণা একটা বিমূর্ত ভাব (abstract idea) মাত্র। যদি কেউ প্রশ্ন করে বসে, ইংলণ্ডে যে গণতন্ত্র আছে তার প্রমাণ কি? তাহলে সে প্রশ্নের জবাবে আপনাকে বলতে হবে, কেন, পার্লামেণ্ট দেখেন নি? মন্ত্রিসভা এবং বিরোধী দল আছে জানেন না? পাঁচ বছর নতুন পর নির্বাচন হয়, যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তারা গভর্নমেণ্ট বানায়—আপনি দেখছি কোনো কিছুরই খবর রাখেন না!

এইভাবে গণতন্ত্রের স্বরূপ বোঝার চেষ্টা যে অন্ধের হাতি দেখার মতোই কখনও শুঁড়, কখনও পা, কখনও বা কান নিয়ে টানাটানি—তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। হাতি বেচারা লোক কেমন এই ধরনের অনুসন্ধান পদ্ধতি থেকে তা জানবার উপায় নেই।

পার্লামেণ্ট, নির্বাচন, মন্ত্রিসভা, বিরোধী দল—এগুলি গণতন্ত্রের অঙ্গ এবং অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সন্দেহ নেই। তবু গণতন্ত্র বস্তুটি কি এবং কেমন তা বুঝতে হলে এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি হাতড়ে দেখাই যথেষ্ট নয়। তাছাড়া গণতান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান সব দেশে একরকম নয়—প্রতিনিধিত্ব-মূলক প্রতিষ্ঠানগুলির (representative institutions) আকৃতি এবং প্রক্রিয়ার এক এক দেশে এক এক রকম, জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব এবং অধিকারও সব দেশে এক রকম নয়, নির্বাচন-পদ্ধতি সম্পর্কেও সেই একই

কথা বলা চলে। কাজেই বাইরেকার চেহারা দিয়ে বিচার করতে গেলে সত্যে পৌছান যাবে না। সত্যে পৌছাতে হলে সমস্ত ব্যবস্থাটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে এর প্রাণবস্তুটি কি এবং এর পক্ষপাতিত্ব কোন্ দিকে।

বিখ্যাত জেটিসবার্গ বক্তৃতায় এব্রাহাম লিঙ্কন গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন—Government of the people, for the people, by the people—রাষ্ট্রিক আদর্শ (ideal of state) হিসাবে কম লোকই তার বিরোধিতা করবেন। কিন্তু রাষ্ট্রিক আদর্শ হিসাবে লিঙ্কনের এই উক্তিকে গ্রহণ করলেও মুস্কিলে পড়তে হয় 'পিপল্' কথাটি নিয়ে। ইতিহাসের দ্বারস্থ হলেই দেখতে পাব 'পিপল্' বা জনসাধারণ বলতে কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা দিয়ে ঘেরা ভূখণ্ডের সমগ্র অধিবাসীকে কখনও গ্রাহ্য করা হয় নি। গ্রীক নগর-রাষ্ট্রে সর্বপ্রথম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে রাষ্ট্রে নাগরিকদের সমানাধিকার ছিল। কিন্তু সকলেই জানেন ক্রীতদাসদের সে রাষ্ট্রে কোনো অধিকার ছিল না। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে কার্যত শ্রমিকশ্রেণী সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রেও পুঁজিপতিদের অধিকার অস্বীকৃত।

অবশ্য 'পিপল্' কথাটির সংজ্ঞা নিয়ে মাথা না ঘামালে এই ত্রিবিধ রাষ্ট্রই লিঙ্কনের সংজ্ঞার কাঠামোয় নিজেকে আটিয়ে নিতে পারে।

Government by the people বা জনসাধারণের শাসন বলতে যদি শাসন ব্যাপারে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ বোঝায় তাহলে পৃথিবীর কোনো দেশেই এখন সে-রকম গভর্নমেণ্ট নেই। জনসাধারণ কোনো দেশেই প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্র-শাসন করে না—রাষ্ট্র-শাসন যাঁরা করেন তাঁরা নির্বাচন মারফত জনসাধারণের সম্মতি নেন মাত্র। অর্থাৎ, এ-গভর্নমেণ্টকে আমরা বড়োজোর বলতে পারি Government by the consent of the governed—শাসিতের সম্মতি নিয়ে শাসন।

ব্রিটেন, আমেরিকা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন তিন দেশেই নির্বাচন মারফত গভর্নমেণ্ট গঠিত হয়ে থাকে আর তিন দেশের গভর্নমেণ্টই দাবি করে থাকেন তাঁরা জনসাধারণের গভর্নমেণ্ট এবং জনসাধারণের জন্য গভর্নমেণ্ট। অথচ ব্রিটেন, আমেরিকার রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রব্যবস্থা যে এক নয় তা আমরা জানি। ঐ সব দেশের রাষ্ট্রনায়করাও তা গোপন করেন না, বরং জোর গলায় প্রচারই করে থাকেন।

দুই পরস্পরবিরোধী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে যদি একই সংজ্ঞার কাঠামোয় বেমালুম খাটানো যায়—তাহলে বুঝতে হবে কোথাও একটা গলদ আছে। আসল কথা এই যে সংজ্ঞা দিয়ে কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থার বিচার করা চলে না। যে কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থা—তা সে যতই অযৌক্তিক হোক না কেন—ন্যায়নীতির কথা তুলেই তাকে নিজের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণ করতে হয়, আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করতে হয়, প্রচুরতম লোকের প্রভূততম কল্যাণসাধন—Greatest good to the greatest member। আরিস্ততল এই বলেই গ্রীক দাসতন্ত্রের সমর্থন করেছিলেন যে—কোনো কোনো মানুষ প্রকৃতিগত-ভাবেই ক্রীতদাস। সুতরাং দাসতন্ত্রেই তাদের জীবনের পূর্ণতা লাভ সম্ভব। জার্মান জাতির মঙ্গলের কথা তুলেই হিটলার ইহুদী নির্যাতনের সাফাই গেয়েছিলেন।

কাজেই মুখের কথা দিয়ে কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থার বিচার হতে পারে না—বিচার হবে কাজ দিয়ে।

গণতন্ত্র আকাশ থেকে পড়ে নি, কোনো ভগবদ্-নির্বাচিত ব্যবস্থাও এটা নয়। সমাজবিবর্তনের এক বিশেষ স্তরে গণতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। গণতান্ত্রিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের বিকাশও হয়েছে সমাজবিকাশের সঙ্গে পা মিলিয়ে। কাজেই গণতন্ত্রের রূপ ও প্রকৃতি বুঝতে হলে—এই বিকাশের ছন্দেই তাকে দেখতে হবে।

তিন

অবশ্য গণতন্ত্রকে এইভাবে বিবর্তনের ধারায় বিচার করা সম্পর্কে অত্যন্ত বোধগম্য কারণেই আপত্তি উঠে থাকে। এই ধরনের বিচারের মধ্য দিয়ে আমরা যে সিদ্ধান্তে পৌছাই অনেকের কাছে তা অসুবিধাজনক মনে হওয়া স্বাভাবিক। কেননা এর মধ্য দিয়ে প্রচলিত গণতন্ত্র, তথা, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র যে অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত সে কথাটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আর তার ফলে সমাজবিপ্লবের ন্যায্যতাই প্রমাণিত হয়। কাজেই যারা বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই টিঁকিয়ে রাখতে চান—এই বিচারপদ্ধতি তাদের কাছে বর্জনীয় মনে হবেই এবং এ-ও স্বাভাবিক সামাজিক অচলায়তনের সমর্থনে তাঁরা শাশ্বত সত্যের বুলি কপচাবেন। সম্প্রতি "গণতন্ত্র প্রসঙ্গে" নামে একটি পুস্তিকা পড়ার সুযোগ হল—তাতে ঠিক এই ধরনের যুক্তিই আমদানী করা হয়েছে।

পুস্তিকাটির লেখক শ্রীঅম্লান দত্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিপত্তিশালী অধ্যাপক। কাজেই তাঁর মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে উপায় নেই। তাছাড়া পূর্বপক্ষের মত খণ্ডন ন্যায়শাস্ত্রের রীতিও বটে। আমরা সেই রীতিই অনুসরণ করব; শ্রীদত্তের যুক্তিগুলি খণ্ডন করে নিজের যুক্তি উপস্থিত করব।

গ্রন্থান্তর্গত একটি প্রবন্ধে* শ্রীদত্ত যা বলতে চেয়েছেন তার সারমর্ম আমি যদি ঠিক ধরতে পেরে থাকি—তা হচ্ছে এই যে, গণতন্ত্রের ভিত্তি বলে যদি কিছু থেকে থাকে তবে সেটা আধ্যাত্মিক। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সংস্কার অথবা স্বার্থ নিরপেক্ষভাবে সত্য ও ন্যায়ের একটা শাশ্বত প্রতিষ্ঠা আছে। আর এই সত্য ও ন্যায়ের শাশ্বত আদর্শই গণতন্ত্রের সেই আধ্যাত্মিক ভিত্তি।

সত্য এবং ন্যায়ের যদি একটা শাশ্বত আদর্শ থাকে এবং তাই যদি গণতন্ত্রের ভিত্তি হয়—তাহলে এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে গণতন্ত্র একটি শাশ্বত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা। "শ্রেণীগত স্বার্থে সত্যের বিবৃতি বা অপলাপ" যেমন সম্ভব তেমনি গণতন্ত্রের বিকৃতিও সম্ভব। কিন্তু—

> "গণতান্ত্রিক সমাজে নূতন চিন্তা ও সমস্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ক্রমান্বিত সংস্কার ঘটে; ফলে পুঞ্জীভূত অসামঞ্জস্যের শোধনের জন্য 'বৈপ্লবিক' প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না।†

মূল আলোচ্য বিষয়টিতে ফিরে আসার আগে সত্য সম্পর্কে শ্রীদত্তর মতামতটা একটু যাচাই করে দেখা প্রয়োজন।

শ্রীদত্তর যুক্তিগুলি তাঁর নিজের লেখা থেকেই উদ্ধার করে দেওয়া যাক:

> (১) "সত্য সম্বন্ধে মার্ক্সীয় দর্শনে একটা দ্বিধা লক্ষ্য করা যায়। কার্যক্ষেত্রে যে মতটির প্রভাব বেশি তা এই যে, প্রতিটি শ্রেণী সত্য হিসাবে তাই গ্রহণ করে থাকে যাতে তার স্বার্থ সিদ্ধ হয়; এবং এই দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে কোনো নিঃশ্রেণীয় সত্যের কল্পনা, বিশেষত সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, ছলনামাত্র।"...
>
> (২) "কিন্তু শ্রেণীসত্য বলে কোনো সত্যই নেই। এ বিষয়ে সিডনি হুকের মন্তব্য স্মরণীয়। শ্রেণীসত্য বলে কোনো বস্তু নেই;

---

*গণতন্ত্রের আধ্যাত্মিক ভিত্তি

†গণতন্ত্র ও সমাজবিবর্তন

শ্রেণীগত স্বার্থে সত্যের বিকৃতি বা অপলাপ আছে মাত্র। যেমন সত্যের শ্রেণীগত বিকৃতি আছে ন্যায়েরও তেমনই। কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের এই শ্রেণীগত বিকৃতি স্বীকার করতে হলেও শ্রেণীস্বার্থের ঊর্ধ্বে সত্য ও ন্যায়ের একটি আদর্শগত প্রতিষ্ঠা স্বীকার করা প্রয়োজন।"

> (৩) "নাৎসী জার্মানীর অন্যতম অধিনেতা হিমলারের একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা অসঙ্গত হবে না। হিমলার বলেছিলেন: We don't care a hoot wheather this or something else was the real truth...science proceeds from hypotheses that change every year or two. So, there is no reason why the party shall not lay down a particulat hypothesis as the starting point, even if it runs counter to current scientific opinion. The one and only thing that matters is to have ideas of history that strengthen people in their necessary national pride....
>
> কম্যুনিস্ট-শাসিত সোভিয়েত দেশেও একই দুর্লক্ষণ বারবার দেখা গেছে। ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে ইতিবৃত্তকে (Sic !) মিথ্যাভাষণে পরিণত করতে কম্যুনিস্ট নেতারা ইতস্তত করেন নি।"
>
> (৪) "পোলানীর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে এই অধ্যায়টি শেষ করা যেতে পারে,
>
> 'The totalitarian form of the state arises logically from the denial of reality of this realm of transcendent ideas. When the spiritual foundation of all freely dedicated human activities—of the cultivation of science and scholarship, of the vindication of justice, of the profession of religion, of the pursuit of free art and free political discussions—when the transcendent ground of all these free activities are summarily denied, then the state becomes of necessity, inheritor to all ultimate devotion of men. For if truth is not real and absolute, then it may seem proper that the public authorities

should decide what should be called the truth.' (Michael Polanyi : The Logic of Liberty)—অর্থাৎ, যদি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে এমন কোনো আদর্শ না থাকে যে আদর্শের সেবায় জীবন উৎসর্গ করা যায় তাহলে সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে রাষ্ট্রের শরণার্থী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আর সত্যের যদি কোনো তৎপ্রতিষ্ঠা না থাকে, তাহলে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "সত্য" নির্ধারিত করা অযৌক্তিক বিবেচিত নাও হতে পারে।"*

সিডনি হুক কি বলেছেন তাতে কিছু আসে যায় না। সত্যের বিচার যুক্তিতে, তথ্যে—সিডনি হুকের উক্তিতে নয়। অতএব সিডনি হুক কি বলেছেন না বলেছেন তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাব না—আমরা শ্রীদত্তের যুক্তিগুলিই বিচার করে দেখব। কিন্তু প্রথমেই হোঁচট খেতে হচ্ছে—"শ্রেণীসত্য" বলতে শ্রীদত্ত কি বোঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। "শ্রেণীসত্য" বলে কিছু আছে—মার্কস, এঙ্গেলস্ বা লেনিন এমন কথা কোথাও বলেছেন বলে বর্তমান লেখকের তো জানা নেই। শ্রীদত্ত যদি এ-বিষয়ে কিছু আলোকপাত করেন তো জ্ঞানবৃদ্ধির সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ বোধ করি।

যতদূর জানা আছে, আইডিয়া এবং বাস্তবের মধ্যে (objective reality) মিলকেই (correspondence) মার্কসবাদ সত্য বলে গ্রহণ করে।† মার্কসবাদ বলে, আইডিয়া এবং বাস্তবের মধ্যে এই মিল (correspondence) ধীরে ধীরে (gradual) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অনেক সময়ই তা থাকে অসম্পূর্ণ এবং আংশিক।

'জন্মালে মরিতে হবে' বা ১০০° সেন্টিগ্রেডে জল বাষ্প হয় এবং শূন্য ডিগ্রিতে বরফ এই সব আইডিয়া বাস্তবের সঙ্গে মিলে যায়—তাই তা সত্য। মজুরের কাছেও সত্য, মনিবের কাছেও তাই।

তবে হাঁ, মার্কসবাদী সত্যের আপেক্ষিকতা স্বীকার করে। মার্কসবাদী মনে করে পরিবর্তমান এই বিশ্বে সব কিছু বদলায়, প্রকৃতি বদলায়, সমাজ বদলায়—বদলে যায় মানুষের আচার এবং অভ্যাস, ন্যায়নীতির ধারণা। আর আইডিয়ার সঙ্গে বাস্তবের মিলই (correspondence) যদি সত্যের সংজ্ঞা হয় তাহলে সত্যও না বদলে পারে না।

*উপরোক্ত চারটি উদ্ধৃতিই 'গণতন্ত্রের আধ্যাত্মিক ভিত্তি' প্রবন্ধটি থেকে নেওয়া।
†Dialectical Materialism (Vol. III) : Maurice Cornforth, p. 173

তবে কি পরম (absolute) সত্য, শাশ্বত (eternal) সত্য বলে কিছু নেই? নিশ্চয়ই আছে। দুইয়ে দুইয়ে চার হয়, কলকাতা বাঙলা দেশে, ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল দুই সমকোণের সমান, খেতে না পেলে মানুষ মরে যায়—এগুলি নিশ্চয়ই পরম সত্য, শাশ্বত সত্য।

ভৌতিক বিজ্ঞানসমূহ গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ইত্যাদি যা অল্পবিস্তর গণিতের নিয়মাধীন (এঙ্গেলসের অনুসরণ করে বলতে পারি—সহজ জিনিসের কেউ যদি গালভরা নাম দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চান, তাহলে বলতে পারেন) তার মারফত এমন কতকগুলি সিদ্ধান্তে পৌছান যায় যা পরম সত্য, শাশ্বত সত্য। এই কারণেই এই বিজ্ঞানসমূহের নাম exact sciences। কিন্তু এই সব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সবগুলি পরীক্ষার ফল সম্পর্কে এ কথা বলা যায় না। এঙ্গেলস্ বলেছেন : With the introduction of variable magnitudes and the extension of their variability to the infinitely small and infinitely large, mathematics, in other respects so strictly moral, fell from grace ; it ate of the tree of knowledge, which opened up to it a career of most colossal achievements, but at the same time a path of error. The virgin state of absolute validity and irrefutable certainty of everything mathematical was gone forever....*

জ্যোতির্বিদ্যা, বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা কি রসায়নশাস্ত্রে পরম এবং শাশ্বত সত্যের অবস্থা তো আরও শোচনীয়। এখানে তো নিত্য নূতন প্রকল্পের (hypothesis) জন্ম এবং মৃত্যু ঘটছে। যত দিন যাচ্ছে, এখানেও পরম এবং শাশ্বত সত্য ততই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। প্রাণিবিজ্ঞান সম্পর্কেও সেই একই কথা বলা যায়।

শাশ্বত সত্য, পরম সত্যের ধুয়োটা সবচেয়ে জোরালোভাবে ওঠে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। অথচ একটু তলিয়ে বিচার করলেই দেখা যাবে, যে বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের বিষয় মানুষের জীবনধারণের অবস্থা, সামাজিক

*Engels : Anti Duhring, Ch. IX.

সম্পর্ক, আইনসমষ্টি, রাষ্ট্র ও তার উপরিতল (superstructure)—দর্শন, ধর্ম, শিল্প ইত্যাদি সেখানে সত্যে পৌছান কত দুরূহ। প্রাণিজগতে বিবর্তনের ধারা প্রায় নিয়মে বাধা। তাছাড়া, আরিস্ততলের সময় থেকে আজ পর্যন্ত জৈব জগতে (organic specis) পরিবর্তন হয়েছে সামান্যই। কাজেই একটি phenomenonকে সেখানে যত দীর্ঘকাল ধরে অধ্যয়ন করবার সুযোগ পাওয়া যায়—ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার অভাব আছে। মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ক্ষণস্থায়ী। সমাজের ইতিহাসে একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি কদাচিৎ ঘটে এবং তাও নিয়মের ব্যতিক্রম। কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রম যদিবা ঘটে তাও সম্পূর্ণ একই অবস্থার মধ্যে ঘটে না। সভ্যসমাজের আদিতে জমির যৌথমালিকানার অস্তিত্ব ছিল—কিন্তু সর্বত্র তা একভাবে ছিল না এবং তার বিলয়ও একভাবে হয় নি। কোনো একটা বিশেষ সময়ে কোনো একটা বিশেষ জনসমষ্টির মধ্যে প্রচলিত একটি বিশেষ সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থার (যা একান্ত ক্ষণস্থায়ী) সম্বন্ধসমষ্টি এবং পরিণতির উপর নির্ভর করেই এ-বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত করতে হয়। কাজেই সে সিদ্ধান্তের মধ্যে ভুল থাকতে পারে। সুতরাং এখানে কেউ যদি পরম ও শাশ্বত সত্য খুঁজে মরেন তাঁকে নিতান্ত মামুলি কতকগুলি কথা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে, যথা, এখনও পর্যন্ত মানুষ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শাসক এবং শাসিত—এই দুইভাগে বিভক্ত, কিংবা ইংরেজরা আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে গেছে ১৯৪৭ সালের পনরোই আগস্ট, ইত্যাদি।

যাঁরা ছোটকথার গালভরা নাম দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন তাঁরা যদি এই ধরনের শাশ্বত এবং পরম সত্য নিয়ে খুশি থাকতে চান, থাকতে পারেন—কিন্তু সাধারণভাবে মানুষের এই ধরনের truism নিয়ে কাজ চলে না। ব্যবহারিক জীবনে যে ধরনের সত্য নিয়ে আমাদের কারবার করতে হয়—তা অনেক ক্ষেত্রেই আংশিক সত্য, অর্থাৎ, তার মধ্যে অসত্য মিশে থাকে। সেই জন্যই পুরনো সত্য, পুরনো সিদ্ধান্তকে নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন জ্ঞানের আলোকে যাচাই করে নিতে হয়, নতুন করে তাকে সূত্রবদ্ধ করতে হয়। তাই বলে পুরনো সিদ্ধান্ত মিথ্যা বলে প্রমাণ হয় না—যা প্রমাণ হয় তা এই যে, সে সত্য আংশিক, আপেক্ষিক এবং মোটামুটি সত্য (approximate truth)। সত্যের এইটাই বৈশিষ্ট্য এবং বিজ্ঞানের জগতে তা সুবিদিত। আজকে সকলেই জানেন বলবিদ্যার নিউটন সূত্র অনু-পারমাণবিক (sub-atomic)

গতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাই বলে নিউটন সূত্র মিথ্যা হয়ে যায় নি—ইঞ্জিনীয়াররা নির্ভাবনায় চোখ বুজে এই সূত্র ব্যবহার করতে পারেন, তাতে এতটুকু বিপত্তি ঘটবে না। তার মানে নিউটন সূত্র হচ্ছে আংশিক সত্য। কোয়াণ্টাম মেকানিকস সত্যের দিকে আরও অগ্রসর হয়েছে—এর নিয়মগুলি শুধু যে অনু-পারমাণবিক গতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয়; সীমাবদ্ধ প্রয়োগ হিসাবে বলবিদ্যার নিউটন সূত্রও এর অঙ্গীভূত। তাই কোয়াণ্টাম মেকানিকস্‌কে বলা যেতে পারে পূর্ণতর সত্য—যদিও কোয়াণ্টাম মেকানিকস শাশ্বত বা পরম সত্য এমন কথা কোনও বৈজ্ঞানিকই বলবেন না। মানুষ এমনি করেই ক্রমাগত সত্য থেকে পূর্ণতর সত্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পরম সত্যে অবশ্য কখনই পৌছান সম্ভব নয়—কেননা জ্ঞানের সীমা যেমন বাড়ছে, প্রকৃতিও তেমনি হচ্ছে পরিবর্তিত। কিন্তু পরম সত্যে পৌছাতে না পারলেও সত্যের মোটামুটি একটা আন্দাজ আমরা পেতে পারি। সত্যের কতটা আন্দাজ আমরা পাব এবং কতটা সুনির্দিষ্টভাবে তা প্রকাশ করতে সক্ষম হব—তা নির্ভর করে সেই বিশেষ সময়ে সত্যানুসন্ধান ও প্রকাশের উপায়ের (means) উপর। সত্য তাই সত্য প্রকাশের বিশেষ উপায়ের উপর নির্ভরশীল। আমাদের অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণের মাপকাঠিতেই আমরা সত্য প্রকাশ করে থাকি।:

সত্য সম্পর্কে মার্কসবাদী ধারণার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, প্রাসঙ্গিকও নয়। তবু এ-আলোচনায় ছেদ টানার আগে দু-একটি কথা বলা দরকার, আমাদের যুক্তিধারার-পক্ষে তা সহায়কও হবে।

মার্কসবাদ সত্যের আপেক্ষিকতা স্বীকার করে—তাই বলে তা আপেক্ষিকতাবাদী নয়। অজ্ঞেয়তাবাদের গোলকধাঁধায় তাই মার্কসবাদী পথভ্রান্তও নন। মার্কসবাদ জড়জগতের মানবচৈতন্য নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করে। সত্য এই জড়জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, জড়জগতের নিয়মকানুনকেই তা প্রকাশ করে, জড়জগতেরই তা প্রতিফলন। সত্য তাই উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা নয়—তার একটা বাস্তব ভিত্তি আছে। লেনিন লিখেছেন: The materialist dialectics of Marx and Engels certainly does contain relativism, but is not reducible to relativism, that is, it recognises the relativity of all our knowledge, not in the sense of denial of objective truth, but in the sense of the

historically conditioned nature of the limits of the approximation of our knowledge of this truth.*

সত্য সম্পর্কে এই মার্কসীয় ধারণার সঙ্গে ফ্যাশিস্তদের ধারণার যে বিন্দুমাত্র মিল নেই—যে কোনো বুদ্ধিমান পাঠক শ্রীদত্ত প্রদত্ত হিমলারের উক্তিটি স্মরণ করলেই তা বুঝতে পারবেন। মার্কসবাদী প্রয়োজনে সত্য সৃষ্টি করে না। ভুল মানুষমাত্রেরই হয়—মার্কসবাদীদেরও হতে পারে। কিন্তু তাই বলে মার্কসবাদী কখনও বলে না, প্রকৃত সত্যের থোড়াই পরোয়া করি আমরা।

শ্রীদত্ত সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেছেন যে 'ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে ইতিবৃত্তকে (Sic !) মিথ্যাভাষণে পরিণত করতে' নাকি কমিউনিস্ট নেতারা ইতস্তত করেন নি।

একথা ঠিক, সোভিয়েত দেশে ইতিহাসচর্চার সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে এবং সংবাদপত্রে তার যে সব বিবরণাদি প্রকাশিত হয়েছে তাতে ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকা অতিরঞ্জনের অভিযোগও আছে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে, সোভিয়েত দেশ ও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টিতেই তা ধিকৃকৃত হচ্ছে এবং ধিকৃকৃত হচ্ছে মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতি বলেই। কাজেই এর উপর নির্ভর করে যিনি মার্কসবাদ ও ফ্যাশিজমের মিল খুঁজতে যাবেন তিনি হয় নির্বোধ নয়তো জ্ঞানপাপী এবং শেষোক্ত ধরনের ব্যক্তিদের পদ্ধতিটাই আসলে গোয়েবলস্ অনুসৃত পদ্ধতি, জেনেশুনে মিথ্যেকথা বলা এবং পৌনঃপুনিক পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে মিথ্যাকে সত্য করে তোলা।

তবে হয়তো, শ্রীদত্ত, সত্য বলতে বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা বলেন নি, বলতে চেয়েছেন ভাবাদর্শগত সত্যের (ideological truth) কথা। শ্রীদত্ত তাঁর প্রবন্ধে সত্য এবং ন্যায় কথাটা সর্বত্র যেরূপ এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করেছেন তাতে এই সন্দেহই দৃঢ়তর হয়। আর শ্রীদত্তের বক্তব্য যদি এই হয় যে 'শ্রেণীস্বার্থের উর্ধ্বে' ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ ইত্যাদির একটা "আদর্শগত প্রতিষ্ঠা" আছে তাহলে সেটা প্রমাণ করার দায় তাঁরই। কেননা, ইতিহাসের দিকে তাকালে শ্রীদত্তের এই বিশ্বাসের সমর্থনের অভাবই দেখতে পাওয়া যায়। থ্রাসিমেকাস (Thrasymachus) ন্যায় বলতে 'জোর যার মুলুক তার' এই নীতি বুঝতেন এবং এই নীতিকেই তিনি শাশ্বত সত্য বলে মনে করতেন।

* Lenin : Materialism and Empirio-Criticism. Chapter II.

এই নীতি যে আজকের দিনে গ্রাহ্য নয় শ্রীদত্ত মহাশয়ও বোধ হয় তা স্বীকার করবেন। এথেনীয়ান রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই ধারণা অনুস্যূত ছিল যে দাসতান্ত্রিক সভ্যতাই মানবজাতির লক্ষ্যে পৌছবার প্রকৃষ্টতম পথ। এ ধারণাও আজকের দিনে অগ্রাহ্য। ভালো-মন্দ ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে—এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতিকে এ-বিষয়ে কদাচিৎ ঐক্যমত হতে দেখা গেছে। নৈতিকতার আদর্শ এক এক দেশে, এক এক সম্প্রদায়ে, এক এক সমাজে এক এক রকম তো বটেই—অনেক সময় দেখা যায় একের ধারণা অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত। এরূপ ক্ষেত্রে কোন্ মতকে শাশ্বত সত্য বলে গ্রহণ করব ? অবশ্য একথা ঠিক যে এমন কতকগুলি ধারণা আছে যা দীর্ঘকাল ধরে মানবসমাজে প্রচলিত আছে। আজ থেকে কয়েক শো বছর আগে চণ্ডীদাস গেয়েছিলেন—'সবার উপরে মানুষ সত্য'। সব মানুষই ঈশ্বরের অংশ বা সব মানুষের মধ্যেই কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের ঐক্য আছে এই দিক দিয়ে বিচার করলে সব মানুষ সমান—আদিমকাল থেকে এই রকম একটা ধারণাও চলিত আছে। কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলেই দেখা যাবে, আজকের দিনে সমানাধিকার বলতে আমরা যা বুঝি তার সঙ্গে এই ধারণার আকাশ-পাতাল তফাত রয়েছে। চণ্ডীদাস সবার উপরে মানুষ সত্য বলতে দেহ সত্য এই কথাই বলেছিলেন। আজকের দিনে এর অর্থ সম্প্রসারিত হয়েছে। খ্রীষ্টধর্মে মানুষে মানুষে সমতার ধারণা আছে—কিন্তু সেই ধারণার মূলকথাটা এই যে সব মানুষই আদিপাপের অংশ নিয়ে জন্মেছে, সেদিক থেকেই তারা সমান। আজকের দিনে মানুষের সমানাধিকার বলতে আমরা বুঝি মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক এবং সামাজিক সমানাধিকার।

আদিমতম সম্প্রদায়ে মানুষের এক ধরনের সমানাধিকার স্বীকৃত ছিল কিন্তু সে অধিকার ভোগ করত শুধু সেই বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত পুরুষেরা—নারী, ক্রীতদাস এবং আগন্তুকেরা এ-অধিকারে বঞ্চিত ছিল। আজকের দিনে, অন্তত তত্ত্বগতভাবে, সমানাধিকারের পরিধির এবংবিধ সংকোচন অযৌক্তিক ও অন্যায় বলে বিবেচিত হবে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে সাম্যের ভাসাভাসা আদি ধারণা থেকে মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক সমানাধিকারের ধারণায় পৌছাতে হাজার হাজার বছর লেগেছে।

গ্রীক নগররাষ্ট্রে এক ধরনের গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল—কিন্তু আজকের

গণতন্ত্রের সঙ্গে তার আকাশ-পাতাল তফাত। আবার আজকের গণতন্ত্রের সংজ্ঞা সম্পর্কেও নানা মুনির নানা মত।

সমানাধিকার, গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ ইত্যাদি ধারণা কতগুলি বিমূর্ত ভাব। অর্থাৎ, এগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কতকগুলি বস্তুর নাম নয়। সমাজের বিকাশের একটি বিশেষ স্তরে, প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিমূর্তভাবের জন্ম হয়। মানুষ এই বিমূর্তভাবের সাহায্যে জগৎ ও জীবনকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পায়—নীতি-ধর্ম সৃষ্টি করে, আইন-কানুন বানায়—আর এই ভাবেই উদ্ভব হয় ভাবাদর্শগত সত্যের। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী, সচেতনভাবেই হোক আর অচেতনভাবেই হোক—উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কের ভিত্তিতে নৈতিক আদর্শ রচনা করে। এই জন্যই বিভিন্ন শ্রেণীর নৈতিক আদর্শের গরমিল ঘটে, অনেক সময় একের নৈতিক আদর্শ অপরের বিপরীত হয়। এই কারণেই মার্কসবাদীরা বলে থাকেন, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ভাবাদর্শ শ্রেণীস্বার্থ সম্প্রসারণের হাতিয়ার। এবং সমাজ থেকে শ্রেণীভেদ লুপ্ত হলে তবেই "শ্রেণীস্বার্থের উর্ধ্বে" ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ ইত্যাদির একটা "আদর্শগত প্রতিষ্ঠা" সম্ভব হবে—অন্যথায় নয়।

কিন্তু এ-নিয়ে অযথা বাগবিস্তারের প্রয়োজন নেই। উপরে আমরা যে আলোচনা করেছি তা থেকে এখন এ সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই করা যায়—এই পরিবর্তমান বিশ্বে যখন শাশ্বত সত্য বলে কিছু নেই তখন স্বভাবতই তা গণতন্ত্রের ভিত্তি হতে পারে না এবং গণতন্ত্র কোনো শাশ্বত রাষ্ট্রব্যবস্থা নয়।

চার

আগেই বলেছি, গণতন্ত্র একটা রাষ্ট্রব্যবস্থা (form of state)। দেহ ছাড়া যেমন প্রাণ থাকতে পারে না, তেমনি রাষ্ট্র ছাড়া গণতন্ত্রের অস্তিত্বও অসম্ভব। কাজেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং বিবর্তনের ইতিহাস স্বতঃই এ-আলোচনার মধ্যে এসে পড়বে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রেরই জানা আছে, রাষ্ট্র ভগবানের সৃষ্টি নয়, কোনো সাধারণ ইচ্ছার অভিব্যক্তি নয়। কেউ বাহুবলে এর প্রতিষ্ঠা করে নি বা রুশো-হবস্‌-লক কথিত কোনো সামাজিক চুক্তির ফলও নয় রাষ্ট্র। সমাজের বিবর্তনের একটি বিশেষ স্তরে সমাজের প্রয়োজনেই যে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল এ-তত্ত্ব আজকের দিনে এমনকি বনেদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও স্বীকৃত।

মার্কস এবং বিশেষ করে এঙ্গেলস তাঁর Origin of Family, Private Property and the State-এ ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের সাক্ষ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কেমন করে উৎপাদন-ব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমবিভাগ দেখা দেয় আর তার ফলে সমাজ নানা শ্রেণীতে ভাগ হয়ে যায়। শ্রেণীগুলি এমন বিরোধে লিপ্ত হয়ে পড়ে যার কোনো মীমাংসা নেই—সমাজ যা দূর করতে অসমর্থ হয়। রাষ্ট্র এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের অসামঞ্জস্যের ফল ও অভিব্যক্তি। "দ্বন্দ্বরত, পরস্পরবিরোধী অর্থনৈতিক স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীগুলি যাতে নিষ্ফল সংগ্রামে নিজেদের ও গোটা সমাজকেই ধ্বংস না করে ফেলে সেজন্যে একটি শক্তির প্রয়োজন দেখা দেয় যাকে আপাতদৃষ্টিতে সমাজের উর্ধ্বে অবস্থিত মনে হয় এবং যার উদ্দেশ্য শ্রেণীসংঘাতকে প্রশমিত করে "শৃঙ্খলার" গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা ; এই শক্তি সমাজের মধ্য থেকে উদ্ভূত হয়েও সমাজের উর্ধ্বে নিজেকে স্থাপন করে এবং ক্রমশ সমাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়। এই শক্তিই হল রাষ্ট্র।" *

এখানে মনে রাখা দরকার, মার্কসবাদীরা রাষ্ট্র কথাটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে। রাষ্ট্র সমাজ হতে স্বতন্ত্র একটা সশস্ত্র শক্তি। রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করে শোষকশ্রেণী নিজের শ্রেণীস্বার্থ তথা শোষণব্যবস্থা কায়েম রাখে। বেতনভুক স্থায়ী ফৌজ, পুলিশ, জেল রাষ্ট্রের প্রধান উপকরণ। কর্মচারী, বিচারক ও আইন রাষ্ট্রে অপরিহার্য। সুতরাং মার্কসবাদীরা যখন বলেন সমাজ থেকে শ্রেণীবিভাগ বিলুপ্ত হলে রাষ্ট্রেরও বিলোপ ঘটবে তখন তাঁরা শ্রেণীশোষণের হাতিয়ার, সমাজ থেকে স্বতন্ত্র একটা সশস্ত্র শক্তি হিসাবে রাষ্ট্রের বিলোপের কথাই বলে থাকেন। শ্রেণীহীন সমাজে কোনোরূপ সংগঠন থাকবে না এমন কথা বলেন না।

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলসের এ-সব সিদ্ধান্ত স্বকপোলকল্পিত নয়। ইতিহাসের বিশ্লেষণপ্রসূত। তাঁদের সিদ্ধান্ত যে মিথ্যে নয়, ইতিহাসের দিকে তাকালেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এথেনীয় সমাজ যখন প্রভু ও দাস এই দুই শ্রেণীতে ভাগ হয়ে পড়ল তখনই 'জেন্টিল' সংবিধান ভেঙে পড়ল, রাষ্ট্রের আবির্ভাব হল। এথেনীয় নগররাষ্ট্রে গণতন্ত্র ছিল—কিন্তু সে গণতন্ত্র ছিল প্রভুদের। সামন্ততন্ত্রের আমলে রাষ্ট্রক্ষমতা চলে যায় সামন্তপ্রভুদের হাতে। সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ভূমিদাসদের শোষণের হাতিয়ার ছিল। তারপর যখন

* Engels: Origin of Family, Private Property and the State, Ch. X.

সামন্ততন্ত্রের গর্ভে পুঁজিবাদের জন্ম হল, একটু একটু করে শক্তিশালী হয়ে উঠল তখন শুরু হল সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদের সংগ্রাম—ইংলণ্ডে, আমেরিকায়, ফ্রান্সে। বুর্জোয়া-শ্রেণী একটু একটু করে ক্ষমতা অধিকার করল এবং এখনও পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশে তারা সে ক্ষমতা বজায় রেখেছে।

বুর্জোয়া-শ্রেণী যখন ক্ষমতা অধিকার করে তখন প্রয়োজনের তাগিদেই তাদের মানুষের স্বাধীনতা ইত্যাদির কথা বলতে হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের মূলমন্ত্র ছিল—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। কিন্তু সেই ফরাসী বিপ্লব শেষ পর্যন্ত মজুরশ্রেণীকে স্বাধীনতা দেয় নি, সাম্য এবং মৈত্রীও প্রতিষ্ঠা করে নি। আর্থার রোজেনবার্গ কমিউনিস্ট নন কিন্তু তিনিও লিখেছেন: The democracy of the great French Revolution is in agreement with the democracy of America of antiquity in that it does not concede any privilege at all to the industrial employee (Rosenberg : Democracy and Socialism, p. 14) বুর্জোয়াশ্রেণী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে নিজেদের স্বার্থে—ভূমিদাসদের মুক্তি দিয়েছে নিজেদের প্রয়োজনে। ভূমিদাসরা যদি মুক্ত হয়ে শ্রমশক্তি বিক্রি করতে না আসে তাহলে কলকারখানার চাকা যে অচল হবে। দ্বিতীয়ত, সামন্তপ্রভুদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার জন্য উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রয়োজন ছিল ব্যাপক জনসমর্থন সংগ্রহের। তাই সেদিন বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিতে তারা কার্পণ্য করেন নি। অধ্যাপক লাস্কি লিখেছেন: The men who made both the English and French Revolutions announced themselves as protagonists of the Rights of Man but any analysis of the measures by which they gave effect to their principles, or, even more, any analysis of the claims they regarded as inadmissible shows clearly that by the 'Rights of Man' they meant in actual fact the rights of that limited class of men who owns the instruments of production in society." (Laski : State in Theory and Practice).

সে মানবিক অধিকারের স্বীকৃতির উপর আধুনিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত তা সমাজের উৎপাদনব্যবস্থার মালিক এই মুষ্টিমেয় লোকসমষ্টির মানবিক অধিকার। অর্থাৎ, দাসতান্ত্রিক গ্রীক নগররাষ্ট্রে গণতন্ত্র যেমন ছিল প্রভুদের

তেমনি আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে গণতন্ত্র হচ্ছে পুঁজিবাদী শ্রেণীর গণতন্ত্র। * এটা "শ্রেণীগত স্বার্থে" গণতন্ত্রের বিকৃতি নয়—এটা অনিবার্য। আমরা আগেই দেখিয়েছি রাষ্ট্র হচ্ছে শোষণের হাতিয়ার। আর গণতন্ত্র একটা রাষ্ট্রব্যবস্থাই। তাই দাসতন্ত্রে গণতন্ত্র ছিল ক্রীতদাসদের শোষণের হাতিয়ার আর পুঁজিতন্ত্রে গণতন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণের হাতিয়ার।

অবশ্য একথা স্বীকার্য, আধুনিক গণতন্ত্রের আমলে মানবিক অধিকারের কিছুটা সম্প্রসারণ ঘটেছে। এই সম্প্রসারণ অনেকটা সম্ভব হয়েছে জনসাধারণের সংঘশক্তির জোরে। অবশ্য এর অন্য কারণও আছে।

১৭৬৫ থেকে ১৮১৫ সাল হচ্ছে আধুনিক গণতন্ত্রের প্রথম যুগ। ঠিক এই পঞ্চাশ বছরই আবার ইতিহাসের বৃহত্তম technological বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। উৎপাদনের অভূতপূর্ব প্রসার হয়েছে। বুর্জোয়া-শ্রেণীর চোখে তখন দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন। এই সময় ব্যাপক জনসাধারণকে কিছু কিছু রাজনৈতিক ক্ষমতা দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল। কিন্তু সে ক্ষমতাও তারা দিয়েছিল এই শর্তে যে তা কখনও পুঁজিবাদী-ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদের জন্য ব্যবহার করা হবে না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ছিঁটেফোঁটা সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বঞ্চিত মানুষকে ভুলিয়ে রাখা, মোহগ্রস্ত করা। "Social legislation is not the outcome of a rational and objective willing of the common good by all members of the community alike ; it is the price paid for those legal principles which secure the predominance of the owners of property···It is a body of concessions offered to avert a decisive challange to the principles by which their authority is maintained. (Laski : State In Theory and Practice)

যখনই জনসাধারণ তাদের এই রাজনৈতিক অধিকারকে ব্যবহার করে রাষ্ট্রনৈতিক বনিয়াদকে বদলাবার প্রয়াস পেয়েছে তখনই পুঁজিবাদীদের গণতন্ত্রের মুখোশ খসে পড়েছে। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত স্পেনের গভর্নমেণ্টকে যখন ফ্যাশিস্ত চক্রশক্তির সাহায্যে একটু একটু করে উচ্ছেদ করা

* টনি (Equality), লাস্কি (American Democracy), রাইট মিল্‌স্ (Power Elite), প্যাকার্ড (Status Seekers) প্রমুখ অকমিউনিস্ট লেখকদের গ্রন্থ থেকেই আমাদের এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে ভূরি ভূরি সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করা যায়। কিন্তু তার জন্য একটা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের পরিসর প্রয়োজন হবে।

হল—"গণতান্ত্রিক" দেশ তার বিরুদ্ধে একটি অঙ্গুলিও হেলন করে নি। গুয়াতেমালার নির্বাচিত সরকারকে মার্কিন প্ররোচনায় সেদিন উচ্ছেদ করা হল সম্পূর্ণ পশুশক্তির সাহায্যে। ঘরের কাছে, কেরালার দৃষ্টান্তও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। কেরালার কমিউনিস্ট সরকার ভারতীয় সংবিধানের চৌহদ্দির মধ্যে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। তা সত্ত্বেও বিত্তবানদের পক্ষে তা বিপজ্জনক মনে হয়েছে।

পুঁজিবাদের বিকাশের যুগে জনসাধারণকে যে সব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সম্ভব ছিল—এখন আর তা দেওয়া সম্ভব নয়। সংকট এখন ঘরে ও বাইরে। ঘরে অর্থনৈতিক সংকট, বাইরে কমিউনিস্ট-রাষ্ট্রগুলির বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত। পুঁজিতন্ত্রের উদারনৈতিক-গণতন্ত্রী মুখোশ তাই এখন ক্রমশ খসে পড়ছে। আমেরিকার ম্যাকার্থিতন্ত্র কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। তা যদি হত তাহলে ম্যাকার্থির শবের সঙ্গেই তাকে কবরস্থ করা হত—একটু ভদ্রস্থ করে তাকে জীইয়ে রাখা হত না। ফ্রান্সের রঙ্গমঞ্চে দ্য গলের পুনরাবির্ভাব, এমনকি দ্য গলের চেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল কোলনদের ক্ষমতা অধিকারের প্রয়াস, ফ্যাশিস্ত ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি, পশ্চিম জর্মানীতে নাৎসীদের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়, কিউবার প্রতিবিপ্লব খুঁচিয়ে তোলার চেষ্টা সবই হয়তো একই শেকলের ভিন্ন ভিন্ন আংটা। সুতরাং গণতন্ত্র একটা আত্মসংশোধনমূলক প্রতিষ্ঠান, নিজের দোষত্রুটি শুধরে নিয়ে ক্রমশ তা সর্বজনীন হয়ে উঠছে—এ সিদ্ধান্ত ধোপে টেঁকে না।

গণতন্ত্রের এবংবিধ পরিণতি অনিবার্য। গণতন্ত্রের ভিত্তি আধ্যাত্মিক নয়, আর্থনীতিক। গণতন্ত্র কোনো শাশ্বত আদর্শও নয়। গণতন্ত্র একটা রাষ্ট্র-ব্যবস্থা। রাষ্ট্র শ্রেণীদ্বন্দ্বের অসামঞ্জস্যের ফল। সমাজ থেকে যেদিন শ্রেণীবিরোধ দূর হবে—রাষ্ট্রের স্থান সেদিন হবে, এঙ্গেলসের ভাষায়, প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে। স্বভাবতই, রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রাদর্শ হিসাবে গণতন্ত্রের স্থানও হবে সেই একই জায়গায়।

এ-কোনো অলস কল্পনা নয়। পৃথিবীর একতৃতীয়াংশে বুর্জোয়াশ্রেণী ইতিমধ্যেই ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে, সেখানে স্থাপিত হয়েছে শোষিতশ্রেণীর গণতন্ত্র। শ্রমিকশ্রেণী সেখানে শ্রেণীহীন সমাজের বনিয়াদ রচনা করছে এবং এমনিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে রাষ্ট্রহীন সমাজের দিকে—নানা ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও।

পত্রিকা প্রসঙ্গ

নৈহাটী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র মহাবিদ্যালয় পত্রিকা, ১৩৬৭-১৩৬৮॥
যুগ্ম-সম্পাদক : সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা রায়॥

নৈহাটী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের দিবাবিভাগের পত্রিকাটি রবীন্দ্রসংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য আলোচ্য পত্রিকাটির প্রথম পর্বে রবীন্দ্র-বিষয়ক প্রবন্ধাবলীই এর প্রথম এবং একমাত্র আকর্ষণ নয়। এ ছাড়াও কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ প্রভৃতিও স্থান পেয়েছে। কলেজের প্রাক্তন ছাত্র পতিতপাবন [...]-র 'তোমাকে পেয়েছি তবু হারাই' রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে অনুভূত শ্রদ্ধার প্রকাশ। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সুন্দর রবীন্দ্রবন্দনায় "সৃষ্টিতে শান্ত অফুরন্ত রবীন্দ্র ঠাকুরকে" অনুভব করেছেন জীবনের মধ্যে। শক্তিপ্রসাদ ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' রচনাটিও সতেজ অনুভবলব্ধ। রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার দিগ্‌নির্ণয়ে নিয়োজিত প্রবন্ধাবলীই এই পত্রিকাটির প্রধান সম্পদ। কোনো কোনো প্রবন্ধে ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলেও প্রধান হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রপ্রতিভা আত্মীকরণের আন্তরিক ইচ্ছা। রবীন্দ্রনাথ যে এখন দেবতারূপে আমাদের বন্দনীয়ই হয়ে থাকবেন না, তাঁর বহুবিচিত্র প্রতিভার উৎস ধরে ক্রমাগত অবগাহনায় অগ্রসর হওয়াই যে তাঁর প্রতি আমাদের কর্তব্য একথা আমরা স্মরণ করছি প্রতিদিন। পত্রিকান্তর্ভুক্ত অনিন্দিতা রায়ের 'রবীন্দ্রস্মরণে', অসিতকুমার ঘোষের 'রবীন্দ্রনাথ ও ছোটগল্প', সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও সাম্রাজ্যবাদ', ঝর্না বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পত্র সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ। তবে 'পত্রসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ' এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও ছোটগল্প' এই দুটি প্রবন্ধের লেখক রবীন্দ্রমানসের দুইটি বৃহৎ উৎসের যে সন্ধান করেছেন তাতে সমধিক নিষ্ঠা ও সততার পরিচয় আছে। নিয়মিত বিভাগে সংকলিত কবিতাগুলির মধ্যে আন্তরিকতার অভাব না থাকলেও শব্দ-নির্বাচন ও আঙ্গিক রচনায় নৈপুণ্যের অভাব কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্তমান। তবে অনেকগুলি কবিতাতেই প্রতিশ্রুতির পরিচয় দুর্লক্ষ্য নয়। গল্পগুলির মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংলাপসৃষ্টির দুর্বলতা লক্ষিত হয়, প্লটও সর্বত্র সবল নয়। অধ্যাপক শান্তি বসুর 'সত্য ও সাহিত্য' একটি পরিশ্রমী রচনা। ইংরেজী বিভাগেও পরিশ্রমী প্রবন্ধ বর্তমান। অঙ্গসজ্জা ও প্রচ্ছদ আরো সুন্দর হতে পারত।

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

পুস্তক পরিচয়

তিমিরাভিসার ॥ শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। নবভারতী। পাঁচ টাকা॥
সন্ধ্যাসকাল ॥ শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য। চার টাকা পঞ্চাশ ন. প.॥

বাইরে থেকে দেখে একজন মানুষকে কতটুকুই বা চেনা যায়! ধনতান্ত্রিক সভ্যতা ও সমাজ এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছে যখন আজ আমরা প্রায় সকলেই দ্বৈত সত্তার দ্বন্দ্বে দীর্ণ! কত গোপন বেদনা ও বাসনা যে আমরা নিরন্তর বুকের খাঁচার মধ্যে বহন করে চলেছি তার হিসেব কে রাখে! যেন আমরা সবাই এক বিরাট রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করছি। যার বুক ভরে গেছে শুকনো ঝরা পাতার স্তূপে রঙ্গমঞ্চে তার ভূমিকা হয়তো সবচেয়ে সুখী ফুর্তিবাজের। যার রক্তে বিকৃত কামনার আগুন জ্বলছে সে-ই সবার প্রশংসা ও স্তুতি কুড়োচ্ছে ভব্যতা ও শিক্ষার মুখোশ এঁটে। সেজন্যে এসব চরিত্র যখন আধুনিক উপন্যাসে আবির্ভূত হয় তখন তাদের রংকে এক কথায় নীল বা কালো বলে চিহ্নিত করা কঠিন, যেমন করা যেত উপন্যাসের ধ্রুপদী যুগে। কে ভালো কে মন্দ, কে বীর কে দুর্বল, কে শঠ বা সাধু সে বিষয়ে আমরা তখন সহজে মনঃস্থির করতে পারতাম। কিন্তু রঙের নাম ধরে ধরে চরিত্র বিচারের সেই উজ্জ্বল দিনগুলি আজ কোথায় হারিয়ে গেছে।

'তিমিরাভিসার'-এর নায়ক লোকনাথকে সবাই জানে আদর্শ পুরুষ হিসেবে। অথচ সে লুকিয়ে মদের আড্ডায় যায়, সেখানকার মেয়েদের নাচ দেখে বেহুঁশ হয়, আপিসে কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীপক্ষের সংঘর্ষে নিরপেক্ষ থাকে আবার সংকটে সেই হয় কর্মচারীপক্ষের প্রেরণার উৎস। অথচ বলা চলে না যে এগুলি তার চরিত্রের আপাতবিরোধিতা বা দুর্বলতা অথবা তার খামখেয়ালিপনা। মানুষের মনের চেতন, অবচেতন, অচেতন ইত্যাদি স্তরভেদ উদ্‌ভাবনের পরে চরিত্রচিত্রণ কোনো কোনো জনপ্রিয় ও ব্যবসায়ী লেখকের হাতে স্বেচ্ছাচারিতায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ যখন নিজেই তার মনকে জানে না তখন সে নাকি সব কাজই করতে পারে তা সে কাজ পাঠকের

কাছে যতই অবিশ্বাস্য হোক-না কেন। কিন্তু সুখের বিষয় শান্তিরঞ্জনবাবুর হাতে চরিত্রচিত্রণ স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত হয় নি। লোকনাথ তেমন ধরনের চরিত্র নয় যার দ্বারা সমস্তই সম্ভব, কারণ তার চরিত্রে স্ববিরোধিতা থাকলেও তা অকারণ বা অযৌক্তিক নয়। সেজন্যে তার মন্দ কাজও সর্বৈব অপরাধমূলক নয় এবং তার ভালো কাজও সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ নয়। তার চরিত্র স্ববিরোধী হয়েও বুদ্ধিগম্য তথা বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু সে বুদ্ধিজীবী বলেই হয়তো খানিকটা নিষ্প্রাণ। পক্ষান্তরে তার বন্ধু কুমুদ স্বল্প পরিসরেও বিশেষ জীবন্ত। চালাক চকচকে মুখোশ দিয়ে সে লুকিয়ে রেখেছে তার গালে কত কান্নার শুকিয়ে যাওয়া দাগ। বঙ্গভঙ্গের অভিশাপে তার জীবন জর্জরিত এবং তার ট্র্যাজেডিকে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন কটি অল্প রেখায়। শুধু কি কুমুদ? কাজললতা, নীহার, মল্লিকা সকলেই শূন্যতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। কিন্তু সেজন্যে এরা নিজেরা কতটা দায়ী? এরা জীবনের হাতে প্রতারিত। এদের ব্যর্থতার বীজ স্ব-স্ব চরিত্রে নিহিত নেই, তা রয়েছে সামাজিক পরিবেশে, যার প্রবল পরাক্রমের সামনে ব্যক্তি অসহায়, এমনকি এক এক সময় মনে হয় যেন ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নক মাত্র। সবাই যেন চোখ বেঁধে কানামাছি খেলছে এবং অন্ধের মতোই খানায় গিয়ে পড়ছে। আর, এই সমাজ কিসের জোরে চলে তা-ও আমাদের অজ্ঞাত নয়।

কিন্তু 'তিমিরাভিসার'-এ যত বিচিত্র পথের মানুষ এসেছে 'সন্ধ্যাসকাল'-এ, তার অবকাশ সংকীর্ণ। এর পরিণাম হয়তো শুভঙ্করই হয়েছে, কেননা তা শেষোক্ত উপন্যাসে লেখককে অপেক্ষাকৃত বেশি ঘনতা আনতে দিয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। 'তিমিরাভিসার'-এর শুরু মনে হয় কোনও হিন্দী সিনেমার নাইটক্লাবে, যা প্রায় এক অবাস্তব আবহাওয়া গড়ে তুলেছে; এবং এ-উপন্যাসের প্রায় সবকটি চরিত্রেরই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তিমিরাবৃত হলেও প্রায় সবার ব্যর্থতার কাহিনীই অপর কাহিনী থেকে সম্পর্কশূন্য—কাহিনী-গুলির উৎস বা বীজও পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্ন। লোকনাথ-কাজললতার বিচ্ছেদে, এমনকি, কুমুদেরও কোনও অনিবার্য ও অনস্বীকার্য অবদান নেই এবং এইভাবে প্রতিটি কাহিনীই ঘনিষ্ঠ দৃষ্টিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেজন্যে শেষপর্যন্ত বলতে হয় যে এ-উপন্যাসের চরিত্রগুলির শোচনীয় পরিণতির মূলে রয়েছে একালের বিশেষ সামাজিক আবহাওয়া অথচ সে-সমাজের কোনও সম্পূর্ণ রূপ দূরে থাক কোনও মূর্ত রূপও এ-বই পড়ে কল্পনা

করা কঠিন। মনে হয় যেন খবরের কাগজে কতকগুলি case-story পড়ছি যেগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন, যেগুলির সমস্যা একটির থেকে অপরটি স্বতন্ত্র, যে-ঘটনাগুলির বিভিন্ন চরিত্র পরস্পরের সঙ্গে শুধু পরিচয়ের সূত্রে গ্রথিত।

কিন্তু 'সন্ধ্যাসকাল'-এ একমাত্র স্বর্ণকেই যদি নেওয়া যায় তাহলে তার সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশ, ননী, ফণী, সুরমা, সুষমা, সুভাষিনী, ভুজঙ্গ, মুক্তোমালা, মানদা, কুন্দ, লিলি, হেরম্ব, গুইরাম, সুধাময় প্রভৃতি সকলেই এসে পড়ে। অর্থাৎ এ-বইয়ে বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে অনাত্মীয়তা অনেকাংশে লুপ্ত এবং একজনের সমস্যার সঙ্গে আর একজনের সমস্যা কোনো-না-কোনো ভাবে জড়িত। এমনকি একজনের জীবনের সম্বন্ধে তিক্ত উপলব্ধি আর একজনের জীবনোপলব্ধিকে সুস্পষ্টভাবে পরিবর্তিত না করলেও চরিত্রের স্বরূপকে প্রভাবিত করেছে, যেমন মালার কাহিনী করেছে সাবিত্রী ওরফে স্বর্ণকে, কারণ মালা অনেক আগেই ঠেকে শিখেছিল যে ভাঙা কাচ জোড়া লাগে না, কিন্তু সেকথা যেদিন সাবিত্রী মানতে শিখল সেদিন তার বাবা-মা-ভাই-বোনের সঙ্গে পুরো সম্বন্ধটাই পালটে গেল। কী-ই বা চেয়েছিল স্বর্ণ? বাবা শিক্ষক ছিলেন পূর্ববঙ্গে, দাঙ্গার সময় দাদা নিকেশ হয়ে যায়, বৌদি আত্মহত্যা করে। শেষপর্যন্ত মরিয়া হয়ে স্বর্ণ চাকরি করতে নামল যখন তখনও জানত না কোন্ পাতালের পথে সে পা বাড়িয়েছে। শেষে যেদিন পুলিশের খাতায় নাম লিখিয়ে ঘর ভাড়া নিয়ে ষোলো আনা দেহের ব্যবসা শুরু করে দিল তখনও তার আশা ভায়েরা মানুষ হবে, বোনেদের ভালো বিয়ে হবে আর তাদের চোখে সে হবে শহিদ। আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিল হায়! যাদের দিদি বেশ্যা তাদের ভালো হবার অধিকার কোথায়! তাদের বাবা ছিলেন একদা নীতিপরায়ণ শিক্ষক। অথচ তিনিই সবার আগে অভিনব ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেন। মাঝখানে স্বর্ণ, তার একদিকে গৃহস্থ সংসার আর একদিকে মানদার বোনপোর দল যারা জন্মেছেই এঘরে। এই মালা, কুন্দ, পরী, লিলিদের জগৎ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র যার সঙ্গে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার কোনো মিল নেই। 'তিমিরাভিসার'-এর জগৎ খণ্ড খণ্ড হলেও 'সন্ধ্যাসকাল'-এর জগৎ অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ এবং সুসমঞ্জস। সেজন্যে 'সন্ধ্যাসকাল' পাঠকের মনকে নাড়া দিতে সমর্থ। ভাবপ্রবণতায় উত্তাল হয়ে লেখক পতিতাদের মহীয়সী করে তোলেন নি কোথাও, বরং সহানুভূতির সঙ্গে তাদের বেলেল্লা উল্লাসের পেছনে শুকনো ঝরাপাতার উপর দিয়ে

বয়ে-যাওয়া দীর্ঘশ্বাসকে ধরে দিতে চেয়েছেন, মুখোশের আড়ালে বেদনার্ত মুখের ছবিখানি আঁকতে চেয়েছেন।

কিন্তু দুখানি বই একসঙ্গে পড়লে একথা পাঠকের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে আধুনিক সমাজের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা পতিতাবৃত্তি এবং এরই করাল ছায়াতে তাবৎ সংসার মোহ্যমান এবং কোথাও কোনো স্বাভাবিকতা বা অকপটতার আশ্রয় নেই। পতিতাবৃত্তি যে একটা খুব বড় সমস্যা সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ তো কেবল একালের সমস্যা নয়, উপরন্তু এটি সকল সমস্যার কেন্দ্র নয়। সমাজের সবাই লোকনাথ নয় যে বেদানা বা চুমকির মধ্যে সব দ্বন্দ্বের অবসান খোঁজবার যুক্তি বানাবার চেষ্টা করে। দেহ-ব্যবসায়িনীদের প্রসঙ্গ দুটি-বইয়েই ফিরে ফিরে এসেছে; অবশ্য 'সন্ধ্যাসকাল'-এ গত্যন্তর ছিল না, কেননা স্বর্ণ নিজে যে তা-ই। হয়তো লেখক বলতে চেয়েছেন পতিতারা যেমন দেহের ব্যবসায় করে তেমনই গোটা সমাজই সম্প্রতি বিবেক, নীতিবোধ ও আত্মমর্যাদার ব্যবসায়তে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। এটাই যদি লেখকের বক্তব্য হয়ে থাকে তাহলে পতিতাবৃত্তি প্রসঙ্গের পুনঃপুনঃ অবতারণা অনর্থক না হলেও আমার মনে হয় অমন বক্তব্য প্রতিপাদ্য হলে সাম্প্রতিক প্রনষ্ট সমাজেরই যথাযথ রূপায়ণ বাঞ্ছনীয় কেননা অংশ সর্বদা সম্পূর্ণের ধারণা দেয় না। কিন্তু তাহলে এ-প্রশ্ন থেকে যায় যে অস্বাভাবিক জীবনধারার প্রতি লেখকের কেন এই আগ্রহ? ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে কি আমরা ঐতিহাসিক বাস্তবতা আশা করতে পারি না? আশা করি বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বই লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

জেলের ছেলে ॥ ভিলিস লাৎসিস। প্রথম খণ্ড অনুবাদক: রবীন্দ্র মজুমদার। দ্বিতীয় খণ্ড অনুবাদক: রথীন্দ্র সরকার। বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো॥

ছোরা ॥ আনাতোলী রীবাকোভ। অনুবাদক: রথীন্দ্র সরকার। বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো॥

ভিলিস লাৎসিসের 'জেলের ছেলে' দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ একটি সুবৃহৎ উপন্যাস। জেলে-জীবনের সুখ-দুঃখবন্ধুর নানাবিধ সমস্যা আর তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার আন্তরিক উদ্ঘাটন আধুনিক কালের সাহিত্যের একটি প্রধান বিষয়। ধীবর-

জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা, জীবনযাত্রার সরলতা, সুযোগ-সন্ধানী ব্যবসায়ীদের তৎপরতা ও স্বার্থান্বেষীর চক্রান্ত আলোচ্য গ্রন্থটির মধ্যে লেখক তুলে ধরেছেন। সোভিয়েত-পূর্ব শাসন ব্যবস্থায় তাদের জীবনে ছিল না শান্তি—ছিল না স্থিরতা। নানাবিধ অত্যাচারে তারা জর্জরিত হত। লেখক লাৎসিস নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে সেই জীবনকে রূপ দান করেছেন।

উপন্যাসটির অসামান্যতা এর চরিত্রগুলির বাস্তবতায়। মৎস্য ব্যবসায়কে কেন্দ্র করে যে শোষকশ্রেণী ঘুরে বেড়ায়, যারা শোষণ করে নির্মমভাবে, তাদের প্রতিনিধি গারোজার চরিত্র। গারোজার চরিত্রাঙ্কনে লাৎসিস যে নৈপুণ্য ও বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তাতে বিস্মিত হতেই হয়।

এই উপন্যাসটি যখন লেখা হয় ওদেশে তখন প্রতিক্রিয়াশীলদের রাজত্ব। সর্বপ্রকার স্বাধীনতার পরিপন্থী.সেই রাষ্ট্রে বসে সাহিত্যে সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ তুলে ধরা আর সহানুভূতি জ্ঞাপন করা ছিল দুরূহ। প্রগতিশীল ভাবধারার প্রকাশকে ক্ষমা করা হত না। তাকে নির্মমভাবে দমন করাই ছিল সাধারণ রীতি। এইরূপ পটভূমিতে এই উপন্যাসের জন্ম। সুতরাং লেখককে অনেক ইচ্ছাই অপূর্ণ রাখতে হয়েছিল। তথাপি তিনি থিওদোরের ন্যায় সুযোগসন্ধানী, পিত্যেরিসের ন্যায় রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী আর গারোজার মতন শোষকের যে চরিত্র অঙ্কন করেছেন তাতে তাঁর সৎ শিল্পচেতনার যথেষ্ট পরিচয় বর্তমান। উপরোক্ত চরিত্রগুলির যথাযথ পরিণতিতে লেখকের দক্ষতা অপরিসীম। ওস্কারের ন্যায় সৎ মানুষ—যে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখত—তার প্রতি আমাদের মনে সহানুভূতির অভাব নেই। কিংবা ক্লাভার স্বচ্ছ সুন্দর চরিত্র অঙ্কনেও লেখক অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। ভালো ও মন্দ, সরল ও সঙ্কীর্ণ চরিত্র অঙ্কনের ফলে উপন্যাসটির বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। সবচেয়ে যা মূল্যবান তা হল এই সুবৃহৎ উপন্যাসটির মধ্যে লেখকের আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা, যার ফলে কোনো ঘটনা বা চরিত্র অযথা বলে মনে হয় না।

আনাতোলী রীবাকোভ-এর 'ছোরা' একটি কিশোর উপন্যাস। যে বয়সে সব কিছুতেই ঔৎসুক্য, যা নিষেধ করা যায় তার প্রতিই স্বাভাবিক কৌতূহল, নিজের শক্তি সম্পর্কে ধারণার অভাব, সব কিছুতেই আপন কৃতিত্ব দেখানোর ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে সেই বয়সের প্রতিনিধি মিশা এই গ্রন্থের প্রধান চরিত্র। মিশার বন্ধু গেঙ্কা স্লাভা প্রভৃতি পার্শ্বচরিত্রের মাধ্যমে লেখক একটি কিশোর

মনের বিকাশ চিত্রিত করেছেন। নিয়ে গেছেন পরিণতির পথে। কোথাও জটিলতা নেই, নেই কোনো ঘটনার বহুলতা। শিশুচরিত্র বিকাশের সহায়ক-রূপে সব ঘটনাগুলির উপস্থাপনা, বিংশ শতকের একজন কিশোর যে সব কিছুকেই অসহায়ভাবে মেনে নেয় না, সে যে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে চায় ভূত-প্রেত দৈত্য-দানোর অস্তিত্ব, চায় নতুন সমাজ সৃষ্টিতে সাধ্যমত অংশগ্রহণ করতে এ সকলই মিশার চরিত্রের উপাদান। লেখক ধীরে ধীরে, সংযত সঙ্গতভাবে এই বিংশ. শতকীয় কিশোর-চেতনার গ্রন্থি মোচন করেছেন। ভয়, বীভৎসতা, দুঃসাহসিক পৈশাচিক ঘটনার দ্বারা চমকপ্রদ ঘটনার সৃষ্টি করা লেখকের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য—ভয় শিশু মনে সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে না পারে, ভয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে তোলা, যাতে যে কোনো দুঃসাহসী কাজে কিশোর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। শিশুমনস্তত্ত্ব সম্পর্কে রীবাকোভের স্পষ্ট ধারণা এবং তাকে যথাযথ রূপায়ণ এই গ্রন্থটির বিশেষত্ব। যেমন, "গাছের পাতার আড়াল থেকে মিশা বাগানের দিকে তাকায়। নিচু নিচু আপেল গাছ, ডালওয়ালা নাসপাতি গাছ, কম্পবেরীর বেতলতা আর গুজবেরীর ঝোপ। ও মনে মনে ভাবে "আচ্ছা, একই জমিতে পাশা-পাশি গাছগুলো রয়েছে, অথচ একেক গাছে কেন একেক রকমের ফল?" মা যে সন্তানকে ফেলে খেতে পারেন না, সন্তানের প্রতি মায়ের যে গভীর স্নেহ কিশোর মিশা তা কি সুন্দরভাবে জানে। "না, না! তা কী করে হবে? এখুনি যদি ও সবটুকু সাবাড় করে দেয় তাহলে সন্ধ্যের সময় মা নিশ্চয়ই তার নিজের ভাগটা ওকে দিয়ে দেবে, আর নিজে না খেয়ে থাকবে।" এ সকল চিন্তা যে শিশু স্বাভাবিকভাবেই করে তা লেখক ভালোভাবেই জানেন। নিকিৎস্কি দলের আক্রমণের হাত থেকে পলেভোয়কে রক্ষা করার পশ্চাতে মিশার যে সাহস তা চমকপ্রদ। অথচ কখনো মনে প্রশ্ন জাগে না এ সম্ভব কিনা। পুঁজিপতিদের চরিত্র, তাদের স্বার্থপরতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান এটুকু কিশোরের মধ্যে সংগতভাবেই এসেছে। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে এই উপন্যাসের পরিণতি, কিন্তু ঘটনা মুখ্য নয়, কিশোর মানসিকতার পরিচয়ই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ সকল দিক বিচার করে রীবাকোভের 'ছোরা'কে একটি বিশেষ উল্লেখনীয় কিশোর-উপন্যাসের মর্যাদা দিতেই হয়।

দুটি উপন্যাসেরই ভাষান্তর যথাযথ।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

সংস্কৃতি সংবাদ

বিয়োগ-পঞ্জী

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসবের হাওয়া দেশ জুড়ে বইলেও এরই মধ্যে পৃথিবীরই নিয়মে দেশে-বিদেশে দুর্যোগ ও দুশ্চিন্তার কারণও কম জমে নি, আর জীবনের নিভৃততর ক্ষেত্রে বিয়োগ-বিচ্ছেদও কম ঘটে নি। স্বভাবতই প্রথমে এখন মনে পড়বে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আকস্মিক বিয়োগের কথা—কবির শতবৎসর পূর্তি ঘটতে না-ঘটতেই তাঁর একমাত্র পুত্রকে হারানোর ব্যথা বৎসরের বাকি মাসকয়টিকে একটু ভারাক্রান্ত করে তুলবে। রথীন্দ্রনাথ পিতার প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতন প্রভৃতির কাজে আপনাকে প্রচ্ছন্ন করে রাখলেও তাঁর আত্ম-সংহত শিল্পি-মনের প্রমাণ কিছু রেখে গিয়েছেন—বিশেষ করে তাঁর ইংরেজিতে লেখা স্মৃতিকথায়—'On the Edges of Time' গ্রন্থে। রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসায় তা একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ, সুন্দর, সংযত ও সুলিখিত।

শতবার্ষিকী উৎসবের পূর্বক্ষণে আর-একটি রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুরাগী সজ্জনকে আমরা হারাই—তিনি পুরাতন 'পরিচয়'-এর লেখক, আমাদের প্রিয় সুহৃদ বিমলচন্দ্র সিংহ। এত অসময়ে এরূপ বিদ্বান্ ও সুসংস্কৃতমনাঃ মানুষকে হারানো বাঙলা সাহিত্যেরই দুর্ভাগ্য। বাঙালী, বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য তাঁর আন্তরিক দরদ সুবিদিত। অন্য দিকে এই কথা বলাই বোধহয় যথেষ্ট যে, কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলের যে দু-একজন মন্ত্রীকে দেশের মানুষ সৎ ও নির্লোভ বলে শ্রদ্ধা করত বিমলচন্দ্র ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

মাঝখানে ৩রা মে আমাদের প্রিয় সুহৃদ অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ সেনের আকস্মিক বিয়োগ আমাদের বিমূঢ় করে। অনেক দিনের ব্যক্তিগত বন্ধুত্বে এই অজাতশত্রু সদাপ্রফুল্ল মানুষটিকে আমরা শুধু আত্মীয়ের মতো নয়, প্রায় আপনারই দ্বিতীয় সত্তারূপে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছিলাম। তাঁর পরিবার-পরিজনের শোক-সন্তাপে সান্ত্বনা দেবার মতো ভাষা আমাদের নেই। ছাত্রজীবনের বিদ্যানুরাগ পরজীবনে সত্যানুরাগের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ধীরেন্দ্রনাথকে কৃতিত্বের অধিকারী করেছিল, এবং সেই সঙ্গে তাঁর বৈষয়িক

লাভ অপেক্ষা তা ক্ষতিরও কারণ হয়ে উঠেছিল। 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'-এর সম্পাদক-পদ কতকাংশে নিজের রাজনৈতিক মতের প্রতি শ্রদ্ধাবশতই তিনি ত্যাগ করেন—অথচ তিনি সত্যই কোনো দলভুক্ত ছিলেন না। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদন-কর্মও তেমনি শুধু শ্রমিক-আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি ও বিশ্বস্ততার জন্যই তাঁকে হারাতে হয়। কোনো দিন তিনি সেই অন্যায় অবিচারের কাছে মাথা নত করেন নি। রাজনীতিশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসাবে তিনি বুর্জোয়া সংবাদপত্রের ধর্ম ভালো করেই জানতেন। উগ্র মতবাদগ্রস্ত না হয়েও তাঁকে শুধু সততার জন্যই ক্ষতি সইতে হয়েছে। সাংবাদিকরা তাঁর স্মৃতি কী ভাবে উদ্‌যাপিত করবেন জানি না। 'ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতি'র সম্পাদকরূপে তিনি সেই কষ্টকর ও গুরুভার কর্ম যেমন নিষ্ঠা ও অমায়িকতার সঙ্গে উদ্‌যাপন করেছেন, তাতে সেখানে তাঁর স্থান অপূরণীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ-অধ্যাপনার পরে সবেমাত্র তিনি রাষ্ট্রনীতি বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেছিলেন। সে বিভাগের সংস্কার-সাধনের অবকাশ তিনি পান নি। কিন্তু দীর্ঘদিনের অধ্যাপনার ও হৃদয়বত্তার জন্য আমাদের মতোই ছাত্রগণও ধীরেন্দ্রনাথের বিয়োগ আন্তরিক বেদনার সঙ্গে স্মরণ করছে, তা জানি।

বিজ্ঞান কোনো জাতির নয়, ভাষারও নয়, পৃথিবীর মানুষের। তথাপি এদেশে যাঁরা তার আলোক শিখা জ্বালেন তাঁদেরকে এখনো "আমাদের" বলা অন্যায় হবে না। অধ্যাপক কৃষ্ণণের বিয়োগে সমগ্র জগতেরই মানুষ দুঃখিত হবে। তবু আমাদের বেদনা আরও গভীরতর। কারণ, এমন বিজ্ঞান-সাধক এখনো এদেশে কয় জন? সে সাধনায় আমরা আরও অগ্রসর হতে না পারলে এরূপ বিয়োগে আমাদের সান্ত্বনা কোথায়?

"শহীদের ভাষা"

এই রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর বৎসরে নানা মূঢ়তা সত্ত্বেও লজ্জিত বোধ করি না, গৌরবই বোধ করি। এবং সে গৌরবের সর্বাপেক্ষা বড় হেতু শিলচরের শহীদরা। বাঙলা ভাষার গৌরবের কারণ—রবীন্দ্রনাথ, অর্থাৎ বাঙালীর সৃষ্টি-প্রতিভা; বাঙলা ভাষার গৌরবের কারণ—বাঙালীর বীর্যবান ভালোবাসা। সেই ভালোবাসাই শ্রেয় ও শ্রদ্ধেয় যা নিজেকে সসম্মানে দান ও অন্যকে গ্রহণ করতে পারে। এই মহৎ ভালোবাসার ঐশ্বর্যেই বাঙলা ভাষা আজ

শহীদের ভাষা—শুধু কবির ভাষা নয়, ভাবুকের ভাষা নয়, তা বীর্যবান শ্রদ্ধাবান নর-নারীর ভাষা—যাঁরা আত্মবলি দিয়ে তাঁদের ভালোবাসার মর্যাদা রাখতে জানেন। এ প্রমাণ প্রথম দিয়েছিল ঢাকার পথে পূর্ববাঙলার যুবকেরা, এ প্রমাণ আবার দিয়েছে পূর্বপ্রান্তের কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীরা। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসে বাঙালীর রক্তেই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভিষেক অধিক হয়েছে, বাঙালীর রক্তেই সাংস্কৃতিক ঐক্য ও স্বাধীনতারও উদ্বোধন হবে। শান্ত বীর্য ও নম্রতার সঙ্গেই যেন আমাদের এই ঐতিহ্য ও দায়িত্ব আমরা স্বীকার করে নিই। যতদূর জানি—কোনো বাঙালীই একথা বলেন নি—"আমার আত্মবিকাশের দাবিকে অপরের স্বাভাবিক আত্মবিকাশের অধিকার খর্ব করে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, আমার ভাষাই একমাত্র ভাষা।" বাঙালীর পক্ষে এমন কথা বলা হবে আত্মদ্রোহ, কারণ, আমাদের দেড়শত বৎসরের সমস্ত ঐতিহ্যই অন্যরূপ। তা ভারতীয় ঐক্যের, বিশ্বমানবীয় মৈত্রীর; বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনা। এই রবীন্দ্রজয়ন্তীশতকে সেই আদর্শকে বিস্মৃত না হয়ে আমরা যে বাঙলা ভাষার জন্য প্রাণদানের দীক্ষা লাভ করলাম, তাতেই এই বর্ষটি ইতিহাসে আরও স্মরণীয় হয়ে রইল। দেশকে সেবার মধ্য দিয়ে, আত্মদানের মধ্য দিয়ে যেমন "সৃষ্টি" করতে হয়, আপনার করতে হয়, আজ তেমনি বাঙলা ভাষাকেও বাঙালী জনসাধারণ এই শহীদের দীক্ষায় আপনার বলবার অধিকার অর্জন করেছে। মহৎ এই অধিকারকে যেন আমরা ভাষান্ধতায় (linguism) কখনো ক্ষুণ্ণ হতে না দিই! যাঁরা পুত্র-কন্যা, ভ্রাতা-ভগিনী বা স্বজন-সুহৃদ হারিয়েছেন তাঁদের কাউকে সান্ত্বনা দেবার সাধ্য আমাদের নেই—এই চেতনাই মূল সান্ত্বনা যে শহীদের দান মিথ্যা হয় না, বাঙলা ভাষা আজ সেই শহীদের ভাষা!

রবীন্দ্রোৎসব

রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর অর্ধ-বর্ষকাল প্রায় কেটে গেল। অধিকাংশ উৎসব-আয়োজনও সমাপ্ত। প্রধান প্রয়াসের মধ্যে বাকি রয়েছে প্রস্তাবিত রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী শান্তি উৎসব (কলিকাতা, ৩রা-১২ই নভেম্বর), ভারতীয় সরকারী উৎসব (নয়া দিল্লী, ১৩ই-২২শে নভেম্বর) ও বিশ্বভারতীর বর্ষা ও শীতকালীন কোনো কোনো আয়োজন। এ পর্যন্ত উৎসব যেভাবে পালিত হয়েছে তার

একটি হিসাব সংগ্রহ সম্ভব হবে কিনা জানি না, কিন্তু তা করা প্রয়োজন। বর্ষান্তে সমস্ত উৎসব-আয়োজনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশও বিশ্বভারতী কিম্বা ওরূপ কোনো প্রতিষ্ঠানের করা কর্তব্য হবে। আশা করি এজন্য তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা হচ্ছে।

এ পর্যন্ত যা ঘটেছে আমরা জানি তাতে সমগ্রভাবে উৎসবের সর্বাঙ্গীণ শ্রী রক্ষিত হয় নি। কলকাতায় ২৫শে বৈশাখের সরকারী আয়োজনে বাঙলা ভাষা বর্জন ও মন্ত্রিবর হুমায়ুন কবীর মহাশয়ের জাতীয় গ্রন্থাগারের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র-ভানিতে নেহরুর গীতি কাণ্ডজ্ঞানযুক্ত বাঙালীর পক্ষে অন্ততঃ ক্লেশ-দায়ক। বিদেশীয় উৎসবে ভারতীয় প্রতিনিধি প্রেরণ না করার "বহু পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্ত" যদি "বহু পূর্বে" সত্যই গৃহীত হয়ে থাকে তা হলেও পূর্বেই নয়া দিল্লীর কর্তৃপক্ষের বিদেশে ও স্বদেশে তা বিজ্ঞাপিত করা উচিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ তার পরে এই "বহুপূর্বে গৃহীত" সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও মন্ত্রিবর হুমায়ুন কবিরের ইউরোপের তেরোটি (?) দেশে একাই রবীন্দ্র শ্রাদ্ধাধিকারী রূপে দিগ্‌বিজয় যাত্রা ও প্রত্যাবর্তন সেই সিদ্ধান্ত-ভঙ্গেরই কি প্রমাণ নয়? কিন্তু প্রধান কথা, সত্যই এরূপ সিদ্ধান্ত—যখনি তা গৃহীত হোক অসমীচীন। পৃথিবীতেই বোধহয় আজ এমন কোনো দেশ নেই যাতে এক উপলক্ষে না-এক উপলক্ষে ভারতের সরকারী প্রতিনিধিরা সরকারী খরচে ভ্রমণ সুখভোগ না করছেন। কেবল রবীন্দ্র উৎসবের নিমন্ত্রণ-রক্ষার বেলাই কি প্রতিনিধির অভাব ঘটে? না, বিশেষ একজন মন্ত্রী ব্যতীত ভারতবর্ষে রবীন্দ্র-উৎসবের প্রতিনিধিত্ব করবার মতো মানুষ নেই?—এই দু তত্ত্বই দেশবাসীর নিকট অগ্রাহ্য। কিন্তু এখনো বর্ষ শেষ হয় নি। আমরা আশা করি নিমন্ত্রণ রক্ষার বেলা যত ভুলই ঘটে থাকুক, আগামী কয় মাসের ভারতীয় সরকারী বা বেসরকারী উৎসব-আয়োজনে বিদেশীয় অতিথিদের আমন্ত্রণে বা আগমনে সেরূপ মনোভাব সরকার পোষণ করবেন না। "সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে"ই এ উৎসবেরও সম্পূর্ণতা। এ কয় মাসের চেষ্টায় আমরা এখনো হয়তো এই উৎসবকে সর্বাঙ্গীণ শ্রী ও সম্পূর্ণতা দান করতে পারি এ কথাটি স্মরণীয়।

এখনো পর্যন্ত যা আয়োজিত হয়েছে, আমরা মনে করি তাও সামান্য নয়। আর যাই হোক উৎসবের সার্বজনীনতা কারও পক্ষে অগোচর নয়। দেশের মানুষ নিজেদের মতো করে তাদের কবি-পূজার আয়োজন উদ্‌যাপিত

করেছে। ভুলভ্রান্তি স্বভাবতই তাতে ঘটেছে—কেন্দ্রীয় ভাবে জাতীয় নেতৃত্বের উপদেশ-নির্দেশের অভাবে তা না ঘটেই পারে না। কিন্তু যা প্রধান কথা—সাধারণ মানুষের আয়োজনে শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। বহু ক্ষেত্রে উৎসাহের সঙ্গে সত্যকার দায়িত্ববোধেরও সম্মেলন দেখেছি। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য বা সঙ্গীতে আয়োজন শেষ হয় নি; রবীন্দ্রপ্রতিভার সঙ্গে পরিচয়ের বুদ্ধিগ্রাহ্য পথও উন্মুক্ত করবার চেষ্টা ছিল। পূর্ব পূর্ব বৎসরের 'জয়ন্তী' আয়োজনে যে সব ত্রুটি লক্ষিত হত, এবারকার উৎসব অনেকাংশে সে সব ত্রুটিমুক্ত।

আরও উল্লেখযোগ্য—এবার এই উৎসবে বিদগ্ধজন এমনকি শুধু শিক্ষিত শ্রমজীবী কর্মচারীরাই উৎসাহী ছিলেন না। অপেক্ষাকৃত অল্প শিক্ষিত শ্রমিকরাও এ উৎসবের আয়োজন করেছেন। গ্রামের কৃষকেরাও নারী-পুরুষ, সহস্রে সহস্রে দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত নিজেদের এরূপ আয়োজনে কবিকীর্তির সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছেন। দূর পল্লীগ্রামে পথ নির্মাণ, নলকূপ-স্থাপন, গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং সপ্তাহকাল বা পক্ষকালব্যাপী রবীন্দ্র-সাহিত্যের সযত্ন পাঠ—এরূপ সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। একাধিক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার কথাও বলতে পারি। আমাদের সরকারী বা 'কালচারী' চোখে এ সবের মূল্য কী জানি না, কিন্তু কবির চোখে এ সব আয়োজনের মূল্য কী, তা তাঁর লেখা থেকে বোঝা অসম্ভব নয়।

নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণতা আছে। কিন্তু সাধারণ ভাবে বলতে পারি কবি-পূজার এমন ব্যাপক আয়োজন পৃথিবীর অন্য কোনো জাতি করতে পারত কিনা সন্দেহ।

কিশোর-লীলা

এই প্রেক্ষাপটে দেখলে মনে হয়—সংবাদপত্রে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর তিন দর্গায় জবাই করা একটি ইংরেজি লেখা (আমরা 'দু শহরের' লেখাটিই পড়েছি, অন্য কিছুই পড়ি নি) নিয়ে কলরবটা নিতান্তই এক বাজে হুজুগ। বুদ্ধদেব বসু "রবীন্দ্র-ধুত্তোর" সাহিত্য লেখায় জীবনারম্ভ করে, রবীন্দ্র-চরণে 'সব পেয়েছির দেশ' লাভ করে, আবার যদি এখন (সুধীন্দ্রাঞ্জন শলাকায়?) অকস্মাৎ স-জামাতৃক এই বুদ্ধি লাভ করে থাকেন যে, রবীন্দ্রনাথ নিতান্তই দেশের লোককে খুশি করার দায়েই মালার্মে বা বোদলেয়র (বিকল্পে সুধীন্দ্র?) হতে পারলেন

না, তাতেই বা আশ্চর্য হবার কি আছে? মূল বোদলেয়র বা মালার্মে বা কাফ্‌কা আমরা অন্ততঃ কেউ পড়িনি—তিনিও যে পড়েছেন এমন কথা শুনিনি। এ আলোচনায় আমরা অন্ততঃ অধিকারীও নই। এটুকু বুঝি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ বাঙলা ভাষার কবি (এবং আরও কিছু, ছোট গল্পের লেখক, শিল্পী, অনেক কিছু—যা অন্য পাশ্চাত্যরাও নন), ভারতবর্ষের মানুষ, আর আধুনিক পৃথিবীর আধুনিক মানুষের কবি। সে আধুনিকতার সূচনা পাশ্চাত্যে (বিশেষতঃ ইংলণ্ডে) ঘটলেও তা পাশ্চাত্যদের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আধুনিক মন দেখলে মনে করতে হবে তা 'অ-ভারতীয়'—অর্থাৎ ভারতীয় বলতে একমাত্র তা-ই যা অতীত ও মৃত বা মধ্যযুগীয় এবং অচল—এটি ইম্পীরিয়ালিজম-এর যুগের সাহিত্যিকদের প্রচারিত একটি তত্ত্ব। তাদের 'সমাজে' তাদের অতিথিরূপে তাদের মতো করে তাদের বুলি কপচাবেন না কেন বুদ্ধদেব বাবু? যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ। তাছাড়া, বুদ্ধদেববাবুর যা স্বাভাবিক গুণ তাও তো তুচ্ছ নয়। তিনি 'চির-উচ্ছ্বাসী'। কখনো নোয়েল কাওয়ার্ড, কখনো সমারসেট মম, কখনো রবীন্দ্র-সুধীন্দ্র-বোদলেয়র—যখন যা পান তাতেই উচ্ছ্বসিত হতে পারেন। পঞ্চাশোর্ধ (?) একজন অধ্যাপকের মধ্যেও যে এই সরস পঞ্চদশী কিশোরী (স্কুল গার্লের) মনটি চিরসঞ্জীবিত হয়ে আছে, এ কি একটা সামান্য কথা?

'বিচিত্রা' ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রকাশ

শতবার্ষিকী উৎসব কালে বিশ্বভারতী-প্রকাশনী আপনাদের প্রকাশন কর্মসূচী সার্থকভাবে পালন করেছেন। 'বিচিত্রা'র জন্য লোকের আগ্রহ এবং কবি-পক্ষে দোকানে দোকানে রবীন্দ্র-সাহিত্য ক্রেতার ভিড় দেখে যে-কোনো মানুষের উৎসাহ বোধ করবার কথা। তবু তো দেশের সাধারণ মানুষ এখনো প্রায় নিরক্ষর, আর ব্যাপক দুর্মূল্যের বাজারে স্বাক্ষর স্বল্পবিত্তেরও পক্ষে মনের আশা মনেই গোপন করা ছাড়া পথ থাকে না। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা জানি রবীন্দ্ররচনাবলী পদস্থ বাঙালীর গৃহে শোভাবর্ধন করলেও ক্লাবে-'সোসাইটিতে' চিত্তবিনোদন ও সন্ধ্যাযাপনের মতো কর্তব্য যাঁদের প্রতিদিন পালন করতে হয় তাঁরা বাঙলাসাহিত্যের ক্রেতা নন, রবীন্দ্র-সাহিত্যের জন্যও তাঁদের আগ্রহ কম। 'বিচিত্রা'র মতো

স্বল্পমূল্যের গ্রন্থের তাই বিশেষ উপযোগিতা ছিল এবং এ সংকলন প্রকাশের দ্বারা বিশ্বভারতী-প্রকাশনী দেশের সর্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। হাজার পৃষ্ঠার মধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের যা-ই সংগৃহীত হোক অনেক উৎকৃষ্ট রচনা বাদ পড়বে, তা অবধারিত। কিন্তু মোটামুটি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় যে সাধিত হল, এইটিই আসল কথা। উদ্যোক্তাদের সকলকে ধন্যবাদ দেওয়ার সঙ্গে মনে পড়ছে দু-একটি পুস্তক ব্যবসায়ী এ-ক্ষেত্রেও কালোবাজারী মুনাফার লোভ সামলাতে পারছেন না। দুর্মতি কত ভাবেই না জাতিকে কবলিত করছে।

শুধু 'বিচিত্রা' নয়। 'রক্তকরবী', 'শেষসপ্তক', 'বীথিকা', 'কালান্তর', 'স্ফুলিঙ্গ' প্রভৃতিরও নতুন সংস্করণ যথারীতি এ সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে—স্বর্গীয়া ইন্দিরা দেবীর 'রবীন্দ্রস্মৃতি', ইন্দিরা দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রাবলী', আর প্রায় দুষ্প্রাপ্য সেই 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি' ও 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'। সাহিত্য হিসাবে এসবের মূল্য বলা নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু ততধিক মূল্য রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুশীলনেচ্ছু পাঠকের পক্ষে। গ্রন্থসমূহের সম্পাদনায় যত্ন ও জ্ঞানের পরিচয়ও যথেষ্ট পাওয়া যায়।

'রবীন্দ্ররচনাবলী' এখন সাধারণের অনেকেরই আয়ত্ত হবার কথা। এ বিষয়ে প্রাথমিক কাজ যা করবার বিশ্বভারতী-প্রকাশনীর শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন, কানাই সামন্ত মহাশয়দের উদ্যোগে তা সম্পন্ন হয়েছিল, এখন পঃ বঃ সরকার তার ফলভাগী হয়েছেন। কিন্তু সেই প্রাথমিক কাজ তো চূড়ান্ত কাজ নয়; এক হিসেবে তা সূচনা মাত্র, এ কথা রবীন্দ্র-সাহিত্যের মনোযোগী পাঠক জানেন। রবীন্দ্র-রচনার আরও সযত্ন ও প্রামাণিক সংস্করণ এখন প্রয়োজন। বিশ্বভারতী-প্রকাশনী নিশ্চয়ই এ প্রয়োজন অনুভব করেন। এখন তাঁদের যখন পুঁজিরও অভাব নেই, তখন তাঁদের এ কাজে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। উপরোক্ত গ্রন্থগুলির সম্পাদনা দেখেও মনে হয়—রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পাদনায় সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের কয়েকজন্ নিষ্ঠাবান কর্মী বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বিশ্বভারতী-প্রকাশনী আরও সুষ্ঠু ও স্থায়ী পথে তাঁদের সেই কর্ম-ও-পাণ্ডিত্য নিয়োজিত করলে ভবিষ্যতের কাজ আরম্ভ হতে পারে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই—শিক্ষাহীনতা ও অন্নবস্ত্রের অভাব দূর হলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠক ও ক্রেতার সংখ্যা অন্তত

পাঁচগুণ বৃদ্ধি পাবে। অন্য দিকে ক্রমেই রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে গভীরতর অনুশীলনেরও দাবি উঠবে। তাই বিশ্বভারতী-প্রকাশনীর ভবিষ্যৎ মোটেই সীমিত নয়—যদি তাঁরা সরকারের পক্ষচ্ছায়ায় সমাচ্ছন্ন না হন।

আর্নেস্ট হেমিংগোয়ে

আর্নেস্ট হেমিংগোয়ের (২৫শে জুলাই ১৮৯৯—২রা জুলাই, ১৯৬১) অপমৃত্যু অসংখ্য সাহিত্যরসিকের দুঃখের কারণ—যদিও হেমিংগোয়ে স্বয়ং হয়তো তা মানতেন না। কারণ, জীবনে যিনি মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করতেই ভালোবাসতেন তিনি নিশ্চয়ই এরূপ আকস্মিক ও অস্বাভাবিক মৃত্যুকেই মনে করতেন তাঁর দুঃসাহসিক জীবনের যথোচিত ও সুসম্ভব পরিণতি। একালের যুদ্ধ-বিগ্রহ বহু মানুষকেই দুনিবার্য বিপদ ও মৃত্যুভয়ের সঙ্গে একত্রবাসে অভ্যস্ত করে তুলেছে। কোনো কোনো দৃঢ়চিত্ত মানুষের অফুরন্ত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের অবকাশও তাতে না ঘটেছে তা নয়। কিন্তু সাধারণভাবে অত্যাচারী ও অত্যাচারিত দুই পক্ষের মানুষই যে যুদ্ধের অমানুষিকতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে এবং মানব-ধর্মের অধোগতি ঘটেছে, তাতে সন্দেহ নেই। সাধারণ-ভাবে দেখি—হেমিংগোয়ের কঠিন পৌরুষ দুঃসাহসের পরীক্ষায় ঝাঁপিয়ে না পড়ে পারত না। কিন্তু দিকৃপাতহীন যে সাহসে তিনি মৃত্যুর সঙ্গে পরিহাস করতেন তা জীবনে আস্থাহীন 'সিনিকের' সাহস নয়—জীবনে বিশ্বাসী, মানুষের প্রতি আস্থাবান পৌরুষ-ধর্মী মানুষের সাহস। নিশ্চয়ই তা অসাধারণ চিত্ত-সম্পদের পরিচায়ক; কিন্তু তা অস্বাভাবিক এবং মন বা বুদ্ধির বিকৃতির ফল নয়—যুদ্ধ ও ফ্যাশিজম্‌এর তিনি ছিলেন দুর্ধর্ষ শত্রু, স্পেনের গৃহযুদ্ধ থেকে কুবার গণবিপ্লব পর্যন্ত প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁর বলিষ্ঠ বুদ্ধির ও পৌরুষের সে স্বাক্ষ্য সমুজ্জ্বল—ঠিক যে সুস্থ দৃষ্টির অভাবে ফরাসি সাহিত্যিক মালরো আজ দ্য গলের সহযোগী। সুস্থ বীর্য ও জীবনবোধের উপরই হেমিংগোয়ের পৌরুষ-আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল। আফ্রিকার অরণ্যে মৃগয়ার নেশা, গরিলা-শিকার, দু-দুবার বিমান দুর্ঘটনা প্রভৃতি নানা অভিযানে দুর্ঘটনায় যে অশান্তচিত্ত দুর্ধর্ষ (tough) অভিযাত্রী মানুষকে দেখা যায় এবং মার্কিন জগতে যে হত্যায় রক্তপাতে বীভৎসতা ও বিভীষিকা-বিলাসী "প্রবল পশুর" (brute) প্রশস্তি শোনা যায়, তা এক বস্তু নয়। বীর্যবানের

নির্ভীকতা মানবতারই আত্মপ্রসার ; আর যে ভয়-ভীতিহীন সাহসে মানবতার পরিচয় নেই তা পৌরুষ নয়, কাপুরুষের অন্তরের পশুর ঔদ্ধত্যমাত্র।

এই মূল পার্থক্য মনে রেখে হেমিংগোয়েকে আধুনিক সাহিত্যের একজন দিকৃপাল বলতে হয়। তিনি নোবেল পুরস্কার বা অন্য কি পারিতোষিক পেয়েছেন না পেয়েছেন তাতে যায় আসে না—পারিতোষিক-পূজার দিন আমাদেরও শেষ হয়েছে। হেমিংগোয়ে অনেক পারিতোষিকপুষ্টদের অপেক্ষাও বেশি পূজ্য। সাহিত্যে তিনি বিশেষ করে স্মরণীয়—প্রচলিত "প্রবল পশুর" প্রশস্তির স্থলে সত্যই তিনি পৌরুষের, tough বা দেহে-মনে শক্ত মানুষের আদর্শকে স্থাপিত করেছেন—তাই মানুষের মহিমার একটি নাতিস্পষ্ট দিক তাঁর শিল্পমহিমায়-উজ্জ্বল হয়েছে। এই শিল্পমহিমা হেমিংগোয়ের নিজস্ব প্রতিভায় ও প্রক্ররণে আয়ত্ত। ভাষায় ভাবে, বিশেষত স্বল্প সংলাপে, উত্তরে-প্রত্যুত্তরে—সর্বব্যাপী সৃষ্টিকর্মে এমন একটি নতুন রীতি, পদ্ধতি ও আঙ্গিকের পরিচয় আমরা For Whom thė Bell Tolls থেকে The Old Man and the Sea পর্যন্ত তাঁর উপন্যাসে ও তাঁর তেমনি উৎকৃষ্ট ছোটগল্পসমূহে পাই যাতে চমকিত ও চমৎকৃত না হয়ে পারি না। বুঝি যে সাহিত্যের রাজ্যেও এ এক অভিনব অভিযান। এজন্যই সাহিত্যরসিকমাত্রই হেমিংগোয়ের মৃত্যুতে ব্যথিত হবেন—শেষ অবধিও তাঁর শক্তির বিন্দুমাত্র দৈন্য দেখা যায় নি। অবশ্য যা রইল তা সামান্য নয়।

"একমাত্র রাজ্যভাষা"

ইচ্ছা করেই আমরা নীরব থেকেছি—কথা দ্বারা যে সমস্যার সমাধান হয় না, কথা সেখানে জটিলতা বৃদ্ধি করে। গত বৎসরের আসামের 'বাঙালী খেদা' তেমনি একটি ব্যাপার—তার সঙ্গে ভাষার প্রশ্ন জড়িত থাকলেও তার রূপটি বাঙালী খেদা ছাড়া কিছুই নয়। বিশেষতঃ বর্তমান আসাম সরকার কোনো সর্বস্বীকৃত সংখ্যাল্প-রক্ষা নীতি পালন করতে সক্ষম হবেন, কিম্বা ভারত-সরকার তাঁদের তা পালন করাতে পারবেন, এমন ভরসা কোথায়? ধনিকতন্ত্রী দল বা ধনিকতন্ত্রী সরকার এরূপ সমস্যা সমাধান করতে পারেন, এমন প্রমাণও বেশি নেই। তবু নিক্রিয় না থেকে প্রকৃত সমাধানের জন্য চেষ্টা করতেই হয়।

যত দূর মনে পড়ে 'পরিচয়'-এও ব্যক্তিগত ভাবে আমরা অসমীয়া

ভাষাকে ভারতীয় প্রধান ভাষাসমূহের অন্যতম ভাষারূপে গণ্য করেছি, আসাম রাজ্যে তার প্রতিষ্ঠা কামনা করেছি, অসমীয়া সাহিত্যের স্বচ্ছন্দ বিকাশও আমাদের একান্ত কামনা। অসমীয়া ভাষার সঙ্গে বাঙলা ভাষার প্রভেদ সামান্য—পুরাতন অসমীয়া (কামরূপীয়া) ভাষাকে সেদিনের বাঙলা ভাষার একটা রূপ বলেও গণ্য করা চলত। কিন্তু আধুনিক অসমীয়া ভাষা গত এক শতাব্দীর মধ্যে শিবসাগর-ডিব্রুগড়ের কথ্যভাষার উপর ভিত্তি স্থাপন করে কামরূপীয়ার থেকে কতকটা স্বাতন্ত্র্য এবং আধুনিক বাঙলা ভাষা থেকে নিশ্চয়ই আরও একটু দূরত্ব স্থাপন করেছে। তথাপি বাঙলা ও অসমীয়ার লিপি প্রায় এক, দুই-ই পার্থক্য সত্ত্বেও এখনো নিকটতম আত্মীয়। চেষ্টা করলে বাঙালীমাত্রই অসমীয়া শিখতে পারেন, তার চেয়েও কম চেষ্টা করে অসমীয়ারা বাঙলা শিখে থাকেন। তথাপি অসমীয়ার বন্ধুগণ আসামে (ন্যায় হোক বা অন্যায় হোক) অসমীয়া ভাষাকে যে "একমাত্র" সরকারী ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত না করে নিশ্চিন্ত বোধ করছেন না, তার কারণ তাঁদের ভীতি ও হীনম্মন্যতা। মনস্তাত্ত্বিকেরা জানেন, বর্ণচোরা ভয়ই প্রায়শঃ উৎকট উগ্রতারূপে ও হীনম্মন্যতা উৎকট দর্পরূপে আত্মপ্রকাশ করে—বিশেষত যেখানে তা নিরাপদ, যেখানে সহায় সংখ্যার বহুলতা এবং সরকারী দণ্ডধারীদের সক্রিয় ও নিক্রিয় সমর্থন। কিন্তু অসমীয়া মনের এই ভীতি দূর করবার দায়িত্ব আমাদেরও—নিশ্চয়ই আসামী-প্রধান রাজ্যে অসমীয়া রাজ্যভাষা প্রাধান্য লাভ করা ন্যায়সঙ্গত ; সে চেষ্টায় অসমীয়াভাষীদের সহায়তা করাও বাঙালীর প্রয়োজন। হীনম্মন্যতা দূর করার উপায় প্রধানত অসমীয়াদেরই হাতে—শিক্ষায় সংস্কৃতিতে সৃষ্টিমূলক প্রয়াসে তাঁরা অসমীয়া ভাষাকে বিকশিত করে তুলতে না পারলে তা মনের গোপনপ্রদেশে থেকেই যাবে। সেদিকে তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন—আরও অগ্রসর হোন! সৃষ্টির পথে তো বাঙালী-অসমীয়া কেউ কারও বাধা হতে পারে না—রাষ্ট্রীয় খেতাব ও খেলাবের কাড়াকাড়িতে তা জন্মাতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র তো সৃষ্টিশক্তির নিয়ন্তা নন, এমন কি; সর্বক্ষেত্রে যথার্থ পরিপোষকও নন, তাও আমরা জানি। অতএব, সর্বান্তঃকরণে কামনা করুব—অসমীয়া ভাষা নির্ভয় হোক, সৃষ্টিতে সুসম্পন্ন হোক।

কিন্তু বর্তমান আসাম রাজ্যে কি অসমীয়া একমাত্র রাজ্যভাষা হতে পারে? অবশ্য "একমাত্র রাজ্যভাষা" বলতে এ ক্ষেত্রে দেখছি যা বোঝায় তা

"একমাত্র" নয়—কারণ, ইংরেজি তো চলবেই, হিন্দীও 'ভারতরাষ্ট্রের' ভাষারূপে রাজ্যক্ষেত্রেও স্বীকার্য। অতএব একমাত্র অর্থ প্রথমত এই দুটিকে মেনে "একমাত্র"। দ্বিতীয়ত, আসামে (বা যে কোনো রাজ্যে) সংখ্যালঘুরও ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার সংবিধানের দ্বারাই বিহিত। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়ও এই সংখ্যালঘুদের আদমশুমারির খাতায় নিশ্চিহ্ন করলেও তারা নিশ্চিহ্ন হবে না—'বাঙ্গালী খেদা'য়ও বাঙলা ভাষা সেখানে বাঙালীর মধ্যে এবং সাহিত্যিকদের মধ্যে লোপ পাবে না—অন্য ভাষার কথা নাই বা বললাম। অতএব, "একমাত্র" কথাটার মাত্রা কতদূর? বিশেষ করে, আবার প্রশ্ন ওঠে—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাইরেকার অঞ্চল তো অসমীয়াভাষী নয়। ব্রিটিশ শাসনের নিয়মে ওসব অঞ্চল আসাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত; তাই, বর্তমান আসাম রাজ্য সর্বাধিক বহুভাষী রাজ্য। আদামশুমারি মতেও সমগ্র আসামে অসমীয়াভাষীরা সংখ্যায় এখনো শতকরা ৫০ জন নন। অতএব, সরকারী নীতিতে শতকরা ৭০ জন যে ভাষা না বলে সে রাজ্যে সে ভাষা একমাত্র রাজ্য-ভাষা হতে পারে না। আমরা অবশ্য এ তর্কেরও বিরোধী। সম্ভব হলে বর্তমান আসামরাজ্য অটুট থাক, এবং "একমাত্র রাজ্যভাষা" কথাটা যখন প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা, অসমীয়া তখন এ রাজ্যের 'প্রধান রাজ্যভাষা' হোক—আমরা এ কামনা করি। এইজন্যই কামনা করি—আসামের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের অন্যভাষীদেরও ভাষাসমূহ এরূপ 'অন্যতম রাজ্যভাষা' বলে স্বীকৃত হোক; এবং রাজ্যে অসমীয়া 'প্রধান রাজ্যভাষা' এই সত্য মেনেই স্থির করা হোক আসামের কোনো বিশেষ অঞ্চলে বা কোনো বিশেষ বিশেষ কাজে, সে সব 'অন্যতম রাজ্যভাষা'ও সরকারী কাজে প্রযোজ্য হবে।

গোপাল হালদার

আইজেনস্টাইন চলচ্চিত্র-উৎসব প্রসঙ্গে

সম্প্রতি ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে ক্যাথিড্রাল রোডের আকাদেমি ভবনে পাঁচ দিন ধরে সার্গেই আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্র-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। আইজেনস্টাইনের শিল্পকর্মের এতগুলি নিদর্শন পরপর দেখার সুযোগ ইতিপূর্বে অনেকেই পান নি। 'জেনারেল লাইন' ও অসমাপ্ত এবং মুখ্যত মারী সিটন কর্তৃক সম্পাদিত 'টাইম ইন দি সান' অনেকেই প্রথম দেখলেন। প্রতিটি অধিবেশনের শুরুতে মারী সিটন আইজেনস্টাইন ও প্রদর্শিতব্য ছবিটি

সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত ভাষ্য উপস্থিত করেছেন। মারী সিটনের মতামত সর্বক্ষেত্রে তর্কাতীত না হলেও চলচ্চিত্র শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এই বিদুষী রমণীর আলোচনায় আইজেনস্টাইন সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জানা গেল। তাছাড়া একদিন আইজেনস্টাইন সম্পর্কে একটি আলোচনাচক্রে মারী সিটন ও এদেশের চলচ্চিত্র-আন্দোলনের কয়েকজন অগ্রণী ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আলোচনাচক্রের মান যথেষ্ট উন্নত না হলেও ফিল্ম সোসাইটির এই উদ্যোগকে অবশ্যই প্রশংসা করতে হয়। বস্তুত, সাম্প্রতিককালে এমন উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র উৎসব ও অনুষ্ঠান আর হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

রুশ পরিচালক আইজেনস্টাইনকে বিশ শতকের অন্যতম প্রতিভা বললে অত্যুক্তি হবে না। ২৮শে ডিসেম্বর ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পারীর গ্র্যাণ্ড কাফেতে লুমিয়ের ভ্রাতৃযুগল তাঁদের প্রথম ছবি প্রদর্শন করলেন। সরকারীভাবে এই দিনটিকেই সিনেমার জন্মলগ্ন বলা হয়। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে আইজেনস্টাইনের প্রথম ছবি শেষ হল, নাম 'স্ট্রাইক'। ১৯২৫ সালে উঠল 'ব্যাটেলশিপ পটেমকিন'। আইজেনস্টাইনের বয়েস তখন দুয়ের কোঠায়, চলচ্চিত্রশিল্পের বয়েস মাত্র তিরিশ। ফিল্মের নির্বাক যুগ শেষ হয় নি। ১৯১৭-র বিপ্লবের পর মাত্র সাত বছর কেটেছে। আর, কি প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে কি মহান্ আবেগ ও চেতনায় একটা গোটা দেশ নতুন ইতিহাস তৈরি করছে, সে খবরও কারোর অজানা নয়।

আইজেনস্টাইনের যাবতীয় শিল্পকর্মের সঙ্গে সন-তারিখের এই যোগাযোগ-গুলি অবশ্য স্মরণীয়। শিল্প মাধ্যম হিসেবে ফিল্মের জন্ম প্রায় আইজেন-স্টাইনেরই সঙ্গে। আর পৃথিবীর এই নবীনতম আর্টফর্মের বিকাশ ও যৌবন লাভ মুখ্যত আইজেনস্টাইনেরই হাতে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনুপ্রেরণা এই জনপ্রিয় শিল্প মাধ্যমের আত্মপ্রতিষ্ঠায় যে অনিবার্য ছিল, অপরপক্ষে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও দেশ গঠনে যে এই শিল্পকর্মের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ-ইতিহাস তা প্রমাণ করেছে।

অঙ্কের ছাত্র, যাঁর হওয়ার কথা সিভিল এঞ্জিনীয়ার, গৃহযুদ্ধের ঘূর্ণাবর্ত তাঁকে ঠেলে দিল এক নতুন ভবিষ্যতে। শান্তি প্রতিষ্ঠার পর আইজেনস্টাইন 'ইনস্টিট্যুট অফ সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং'-এ আর ফিরলেন না, যোগ দিলেন 'ফার্স্ট প্রলেটকাল্ট ওয়ার্কার্স থিয়েটার'-এ। প্রথমে নক্শাবিদ, পরে

মঞ্চ অধিকর্তা এবং শেষে সেই একই প্রতিষ্ঠানের তিনি হলেন চলচ্চিত্র-পরিচালক। চিত্রকলায় আজন্ম অনুরাগ তাঁর চলচ্চিত্রজীবনের বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। আইজেনস্টাইনই সম্ভবত প্রথম ছবি এঁকে ফিল্ম স্ক্রিপ্ট তৈরি করেন। তাঁর চিত্রকর্মের যে সামান্য নিদর্শন দেখেছি তাতেও প্রতিভার ছাপ স্পষ্ট।

শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে কোনো শিল্পীর বিকাশ ও স্বাধীনতাকে খর্ব করে না, প্রলেটারীয় সংস্কৃতি যে পৃথিবীর মহত্তম সভ্যতারই শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক আইজেনস্টাইন তা প্রমাণ করেছেন। আপন শিল্প জীবনের প্রাথমিক পর্ব সম্পর্কে আইজেনস্টাইন বলছেন "What was important was that my thirst for that mysterious thing called *art* was unquenchable and insatiable. No sacrifice seemed too great.

In order to be sent from the front lines to Moscow I entered the Oriental Languages Department of the General Staff Academy. To do that I had to master one thousand Japanese words and hundreds of quaint hieroglyphs.

The Academy meant more than just Moscow. It meant a possibility of learning the East, of gaining access to the fountain-head of the "magic" of art which, for me, was associated with Japan and China...

How grateful I was to fate for having subjected me to the ordeal of learning an oriental language, opening before me that strange way of thinking and teaching me word pictograph. It was precisely "unusual" way of thinking that later helped me to master the nature of *montage*, and still later, when I came to recognize this "unusual", "emotional" way of thinking, different from our common "logical" way, *this helped me to comprehend the most recondite in the methods of art.*" (Notes of a film Director. pp. 10-11. Italics আমার)।

প্রত্যেকটি শিল্প মাধ্যমেরই এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু অন্য শিল্প মাধ্যমগুলির নানা বিশিষ্টতা নিয়ত তাকে পুষ্ট করে এবং আপন মৌল চরিত্র অক্ষুণ্ণ রেখে সে ক্রমাগত বিকশিত হয়। সাহিত্যে দেখেছি গল্প-কবিতা-উপন্যাস-নাটক কি ভাবে পরস্পরের কাছে চলে আসছে এবং কি ভাবে তার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখছে। চিত্রে তাই, ভাস্কর্যে তাই। এমন কি সঙ্গীত ও নৃত্যও আপন মাধ্যমের তথাকথিত শুদ্ধতা বজায় রাখতে পারে নি। নাটক ও চলচ্চিত্রের প্রয়োগ-পরিচালনায় শিল্পমাধ্যমগুলির এই পারস্পরিক ঋণের সমাহার সব থেকে বেশি স্পষ্ট ও অনিবার্য। সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীতের বহু বিশিষ্টতা অর্জন করে তার জন্ম, তার বিকাশ। এ কারণেই পৃথিবীর তাবৎ সভ্যতা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অধ্যবসায়ী ছাত্র হিসেবে আইজেনস্টাইনকে দেখি। সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, নন্দনতত্ত্ব; বিশেষত রেনেশাঁস যুগের মহান শিল্পকলা এবং ক্রপদী ও আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে কি অসামান্য জ্ঞান ও সতর্ক অনুধাবনা তাঁর ছিল, সহজে তা অনুমান করা যায় না। শেক্স্পীয়র বলেছেন শিল্পী হবেন স্বর্গ-মর্ত-নরক বিহারী। আইজেনস্টাইন বিশ্বসভ্যতার স্বর্গ-মর্ত-নরক অভিযান করে শিল্পের গোপন রহস্যের মন্ত্রটিকে উদ্ধার করেছিলেন।

সমকালীন সময়, সমাজ ও ব্যক্তির প্রতি প্রবল আনুগত্য এবং চিরকালীন মূল্যবোধগুলির সুদৃঢ় অঙ্গীকরণ; দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি সুষ্ঠ অনুরাগ ও আন্তর্জাতিক মননশীলতায় যথার্থ আসক্তি; ক্রপদী সভ্যতা ও লৌকিক সংস্কৃতিতে নিবিড় মনোযোগ; সর্বোপরি শিল্প ও জীবনের প্রতি সমপরিমাণ নিষ্ঠা আর-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নতুন মূল্যমান সৃষ্টি—এক কথায় প্রলেটারীয় কালচারের মর্মবাণীতে অকুণ্ঠ প্রতীতিই আইজেনস্টাইনের জীবনসাধনার মূলমন্ত্র। প্রখর শিল্পদৃষ্টি ও বিপুল প্রতিভার সমাহারে তা আজ পৃথিবীর এক সম্পদ।

আইজেনস্টাইন পৃথিবীর যে কোনো মহৎ শিল্পীরই মতো আপন শিল্পকর্মে প্রবল উদ্দেশ্যবাদী। লক্ষণীয় যে তথাকথিত বিশুদ্ধ শিল্পবাদীদের মতো উদ্দেশ্যহীনতার চোরাবালিতে তিনি কদাপি পা দেন নি। লক্ষণীয় যে তথাকথিত প্রগতিশীল সংস্কৃতির কোনো কোনো ভ্রান্ত সৈনিকের মতো তাঁর পথ পূর্বনির্দিষ্ট সরল ছকে বাঁধা ছিল না। বিষয়, আঙ্গিক ও বক্তব্যে তুল্যমূল্য সুবহিতিই তাঁকে নিয়ত নিরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই আইজেনস্টাইন একই সঙ্গে সমকালের নিপুণ ভাষ্যকার ও কালোত্তীর্ণ পরিচালক। তাই আইজেনস্টাইন বিপ্লবী—পৃথিবীর মানুষকে যাঁর শিল্প নতুন করে বাঁচার প্রেরণা দেয়। তাই আইজেনস্টাইন শিল্পী—চলচ্চিত্রের জগতে যাঁর থেকে অধিকতর

আঙ্গিক-পারদর্শিতা ও চলচ্চিত্র শিল্পের গূঢ় রহস্যের ওপর এমন যাদুকরী আধিপত্য আদপেই আর কারোর ছিল কিনা সন্দেহ। গণিতবিদ্যায় দক্ষতা, এনজীনিয়ারিং শাস্ত্রের জ্ঞান ও সহজাত শিল্পবোধ—একাধারে এই তিনটি গুণের সমন্বয় আইজেনস্টাইনের শিল্পকলায় প্রায় গাণিতিক নির্ভুলতা ও পরিমিতি আনতে পেরেছিল।

আইজেনস্টাইনকে বলা হয় "পরিচালকদের চরিচালক", যদিচ প্রথমাবধি সাধারণ দর্শকের অভিনন্দনলাভেও তিনি কৃতার্থ। আইজেনস্টাইনের শিল্প-কৃতিত্বের এও এক উল্লেখ্য নিদর্শন—সর্বস্তরের দর্শককেই তিনি অভিভূত করতে পারেন। তথাকথিত জনরুচির কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ বা 'সাধারণ দর্শক' সম্পর্কে উদ্ধত অবহেলা—এর কোনোটিই ছিল না বলে আইজেনস্টাইনের পক্ষে একাধারে শিল্পসৃষ্টি ও রুচিনির্মাণ সম্ভব হয়েছে। প্রলেটারীয় কালচারের প্রধান ভূমিকা তা-ই।

সোভিয়েত লৌহযবনিকা সম্পর্কে সমস্ত বিরুদ্ধ প্রচার এক ফুৎকারে ধ্বসে যায় যদি আমরা মনে রাখি বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায়ই আইজেনস্টাইনের শিল্পকর্মের হাতেখড়ি, সাধনা ও সিদ্ধি। ১৯৩০ সালে 'জেনারেল লাইন' তুলেছিলেন। বিপ্লবের ১৩ বছর পরেও সে দেশের কোনো কোনো গ্রামে যে আর্থনীতিক পশ্চাৎপদতা, সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সংশয় বিদ্যমান ছিল; এমনকি শহরের কেন্দ্রীয় অফিসগুলিতে যে কিছু কিছু ব্যুরোক্রাসিও মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল—আইজেনস্টাইন নির্মম সমালোচনা ও আন্তরিক সহৃদয়তায় সে কথা বলেছেন। আর এই পশ্চাৎপদ গ্রাম থেকে নতুন নায়িকা জন্মাচ্ছে—আপন অভিজ্ঞতায় যে ইতিহাসের সঙ্গে পা ফেলতে বাধ্য হয়, ক্রমে যে ইতিহাসের নায়ক হয়ে ওঠে। এবং সাধারণ মানুষ বা অফিসের কর্তা—কারোর পক্ষেই যে দেশব্রত থেকে সরে থাকা বা ভুল পথে চলা সম্ভব হয় না—জনশক্তি ও বিপ্লবের সঞ্জীবনী মন্ত্র যে নিয়ত সোভিয়েতের তাবৎ অস্তিত্বের অতন্দ্র প্রহরী—আইজেনস্টাইন অসামান্য প্রত্যয়ে সে কথাও তাঁর নিজের ভাষায় বলেছেন।

আইজেনস্টাইনের অপেক্ষাকৃত অল্পপরিচিত এই ফিল্মটির প্রতি আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

প্রথমত সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচালক যে ছবিটি তুলেছিলেন এবং সরকারী উদ্যোগে সমস্ত দেশে যা প্রদর্শিত হত, সেই ছবিটিতে কি অসামান্য

নিরপেক্ষতায় গ্রাম্য কৃষকদের পশ্চাৎপদতা, গ্রাম্য ধনিকদের নিষ্ঠুরতা (অর্থাৎ তখনও গাঁয়ে ধনসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি—এ তথ্যের স্বীকৃতি), সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে চাষীদের অবিশ্বাস, কেন্দ্রীয় সমবায় কার্যালয়ের কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রাম্য সমবায় আন্দোলনের প্রতি ঔদাসীন্য ও ব্যুরোক্রাসি, কেন্দ্রীয় সমবায় কার্যালয়ের পক্ষে গ্রাম্য সমবায়গুলিতে উপযুক্ত ট্রাক্টর ইত্যাদি প্রেরণে অক্ষমতা (অর্থাৎ তখনও উৎপাদন ব্যবস্থা চাহিদা অনুযায়ী হতে না পারা)—প্রভৃতি ঘটনা সম্পর্কে আইজেনস্টাইন তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ উপস্থিত করেছেন।

কিছুটা ডকুমেণ্টারি ধরনে তোলা (এবং ডকুমেণ্টারি মূল্য যে ছবির ক্ষেত্রে সীমাহীন গুণ বলে পরিগণিত) এই চলচ্চিত্রে সমবায় আন্দোলন, কেন্দ্রীয় সমবায় কার্যালয়, অফিস, ট্রাকটার ইত্যাদি তথাকথিত শিল্পগুণহীন বিষয়াবলী অত্যন্ত বাস্তব অত্যন্ত ইতিহাসানুগ অত্যন্ত পরিবেশনিষ্ঠ হয়েও শিল্পের কি যাদুকরী প্রভাবে একটি বিশেষ সময়ের গীতিকাব্য হয়ে উঠতে পারল—তা বিশেষভাবে বিচার্য। আইজেনস্টাইনের অধিকাংশ ছবির মতো 'জেনারেল লাইন'-এরও নায়ক ইতিহাস আর সময় আর গণশক্তি। কিন্তু আইজেনস্টাইনের জনতা একাধারে জনতার সামগ্রিকরূপ অন্যধারে ব্যক্তির বিশিষ্ট চরিত্রে সর্বদা ভাস্বর। 'ব্যাটেলশিপ পটেমকিন'-এর নায়কও ইতিহাস—তার প্রতীক একটি যুদ্ধজাহাজ। কিন্তু 'জেনারেল লাইন'-এ দেখা গেল নায়িকার জন্ম, ব্যক্তির আবির্ভাব—পরবর্তীকালে আইজেনস্টাইনকে 'আলেকজাণ্ডার নেভস্কি' ও 'ইভান দি টেরিবল' সৃষ্টিতে যে মনোভঙ্গি সহায়তা করেছে। ইতিহাস ও ব্যক্তির সম্পর্ক আবিষ্কারে আইজেনস্টাইন এইভাবেই ক্রমাগত নিজেকে নিযুক্ত করেছেন।

তাছাড়া গ্রাম্য সমাজের আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতি সম্পর্কে তিনি যে কি পরিমাণ অবহিত ছিলেন—অনাবৃষ্টিকালে গাঁয়ের করুণ উপাসনার দৃশ্যটি তার প্রমাণ। আর, 'ইভান দি টেরিবল'-এ অভিজাত সমাজের অনুষ্ঠান ও অন্তরঙ্গ জীবনের প্রতিলিপি নির্মাণেও তিনি সমপরিমাণ বিশ্বস্ত। আশ্চর্য এই যে মেক্সিকোর পটভূমিকায় তোলা 'টাইম ইন দি সান' চিত্রে তিনি যখন মেক্সিকোর ইতিহাস ও জীবনকে চলচ্চিত্রে ধরেন—যখন ইতিহাসের স্তরপরম্পরায় মেক্সিকোর অভিজাত ও সাধারণ মানুষ তাদের সর্ববিধ বৈশিষ্ট্যসহ আশ্চর্য শিল্পগুণান্বিত হয়ে পর্দায় উপস্থিত হয়—তখন

আমরা ভেবে পাই না একজন রুশদেশীয় পরিচালকের পক্ষে দক্ষিণ আমেরিকার আত্মা আবিষ্কার এভাবে সম্ভব কি করে! ঐতিহ্য ও আন্তর্জাতিকতা বোধ এবং বিশ্বসভ্যতার চিরন্তন সম্পদগুলিকে আত্মস্থ করা একেই বলেছি। আর ইতিহাসের সর্বযুগের কি অভিজাত কি লৌকিক—সর্বস্তরের (নেভস্কি দ্বাদশ শতকের নায়ক) মানুষের যাবতীয় পরিচয় বিশ্বাস্য ও শিল্পসম্মতভাবে উদ্ধার করা—একেই বলেছি যথার্থ বৈদগ্ধ্য ও ইতিহাসসম্মত বস্তুনিষ্ঠা।

কিন্তু লক্ষণীয় যে পটেমকিন, নেভস্কি ও ইভান-এ যে পরিবেশ ও চরিত্র সৃষ্টি অপেক্ষাকৃত সহজ—'জেনারেল লাইন'-এর মতো ছবির আপাত শুষ্ক, আপাত ডকুমেণ্টারি বিষয়ে শিল্পের সেই যাদুকরী মায়া সৃজন কি দুরূহ! অথচ বারবার এই তথাকথিত ডকুমেণ্টারি মূল্য ছাপিয়ে উঠেছে মানুষের অন্তরের দ্বন্দ্ব ও জটিলতা, সময়ের দ্বন্দ্ব ও জটিলতা, পরিবেশের দ্বন্দ্ব ও জটিলতা। যে চরিত্রগুলি জনতাসৃষ্টির উদ্দেশ্যে আবির্ভূত—তারাও চোখের পলকে আপন বিশিষ্টতা ও রক্তমাংস নিয়ে সমুজ্জ্বল হয়। আর একদিকে যন্ত্র অন্যদিকে প্রকৃতি। আর মানুষ নিজের মূঢ়তা ও সংস্কারের বাঁধ ভেঙ্গে ভেঙ্গে সময়ের সমুদ্রসঙ্গমে অগ্রসর হয়। যৌথখামারের ষাঁড়ের বিয়ে হয়। ক্ষেতে ট্রাক্টর চলে। রমণী দেশব্রতের মাঝখানেও পুরুষকে একদিন ভালোবাসে।

'আলেকজাণ্ডার নেভস্কি' যদি এপিক গুণান্বিত হয়, তাহলে 'জেনারেল লাইন'কে বলব লিরিক। বিপ্লবোত্তর রুশ জীবনের গীতিকাব্য। আর নিছক ডকুমেণ্টারি ছবিতে আইজেনস্টাইন এইভাবে একটি মনোরম গল্প, সূক্ষ্ম অনুভূতির লীলা ও চরিত্রের বিকাশ সৃষ্টিতে সমর্থ হন। তাছাড়া ষাঁড়ের বিবাহের মণ্টাজ প্রভৃতি তো আঙ্গিকগতভাবে বিশ্বচলচ্চিত্রের শিক্ষণীয় সম্পদ।

'টাইম ইন দি সান' মেক্সিকোর পটভূমিকায় পরিকল্পিত এক বিশাল চলচ্চিত্রের অসমাপ্ত রূপ। প্রাচীন যুগ থেকে স্তরপরম্পরায় আধুনিককালের 'বিপ্লব' উত্তর সময় পর্যন্ত এর পটভূমি। দেশ ও কালের এই নির্বাচন অবশ্যই লক্ষণীয়। মেক্সিকোর প্রকৃতি, মানুষ ও সভ্যতা ছিল তাঁর বিষয়। ছবিটিতে বিপ্লবের অংশ মোটেই তোলা হয় নি। শিল্পী হিসেবে আইজেনস্টাইন ছিলেন অস্থির ও অতৃপ্ত। সুতরাং এই অসমাপ্ত ও অন্যের দ্বারা সম্পাদিত ছবিটি দেখে আইজেনস্টাইনের সাধনা ও সিদ্ধি সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছন সম্ভব নয়।

তথাপি মনে হয় বিশেষ করে পটভূমি হিসেবে মেক্সিকোর নির্বাচন এবং মেক্সিকোর সমাজে বিজিত মেক্সিকোবাসীর নিজস্ব প্রাচীন সভ্যতা ও বিজয়ী স্পেনীয় সভ্যতার সংমিশ্রণে উদ্ভূত বর্তমান মেক্সিকোর প্রাণবন্ত সংস্কৃতিতে ও জীবনযাত্রায় তাঁর প্রত্যয় আইজেনস্টাইনকে বিশ্বজনীন প্রাণধর্মের এক মহাকাব্য সংরচনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। 'জেনারেল লাইন'-এর নায়িকা সমকালীন। ইতিহাসের আত্মা সন্ধান করে তিনি রুশ জনগণের নায়ক নেভ্‌স্কিকে পুনরাবিষ্কার করেছেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি স্বভাবই রাশিয়ার ভূখণ্ড অতিক্রম করে মানবসভ্যতার অনির্বাণ দীপশিখাটিকে অন্যত্রও খুঁজেছে। 'মায়া' সভ্যতার প্রতি আকর্ষণ ও মেক্সিকোর মিশ্র সংস্কৃতির প্রতি মমতাই তাঁকে এই নির্বাচনে উদ্বুদ্ধ করেছে। ইতিহাসের যুগে যুগে মেক্সিকোর মানুষ ও জীবন, শিল্প ও সংস্কৃতি, ক্লেশ ও সংগ্রাম সভ্যতার উত্থান-পতন ও নতুন সভ্যতার অভ্যুদয়, মানুষের ভাস্বর জীবনীশক্তির অপরাজেয় বিকাশ—ছবিটির সর্বত্র তা-ই দেখি। দেয়ালচিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, মুখোশ, সঙ্গীত, নৃত্য—ইত্যাকার যাবতীয় সম্পদ যথাযথ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীন যুগে নর-নারীর ভালোবাসার একটি দৃশ্যে শুদ্ধ কবিতার মতো নগ্নতা, নারীবক্ষে ছায়ার বলয়চিহ্ন আমাদের চৈতন্যকে সৌন্দর্যতত্ত্বে নতুন দীক্ষা দিয়েছে। সামাজিক বিবাহোৎসবে গীত একটি গানের সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরগত মিল আমাদের রোমাঞ্চিত করেছে। অভিজাত, যাজক ও সাধারণ মানুষের জীবনের জটিল অথচ ধ্রুব উপস্থাপনা আমাদের মনকে মানুষের নিয়তিতে আস্থাবান করেছে। আর শেষ দৃশ্যের মুখোশ নৃত্যে ফুটফুটে শিশুমুখের হঠাৎ আবির্ভাব বুঝিয়ে দিয়েছে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত মহাদেশের তথা ধনতান্ত্রিক জগতের মুখোশনৃত্যের শেষে এমনি একটি শিশুমুখ হঠাৎ দেখা দেবে। ১৯২৫ সালে 'ব্যাটেলশিপ পটেমকিন'-এ যার প্রথম সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম।

মারী সিটন জানিয়েছেন, 'ব্যাটেলশিপ পটেমকিন' সাধারণত আইজেন-স্টাইনের শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসেবে স্বীকৃত হলেও তাঁর বিবেচনায় 'অক্টোবর'ই আইজেনস্টাইনের মহত্তম অবদান। 'স্ট্রাইক', 'অক্টোবর' এদেশে আজও প্রদর্শিত হয় নি। 'ইভান দি টেরিবল'-এর দ্বিতীয় পর্ব আমি দেখি নি। বস্তুত আইজেনস্টাইন চিত্রমালা দেখার সুযোগ এই প্রথম ঘটল। ব্যাটেলশিপ, নেভস্কি ও ইভান বহু আলোচিত। সুতরাং অন্য দুটি ছবি সম্পর্কে আমার মতো সাধারণ দর্শকের পক্ষে দু-এক কথা বলা সাজে। ফিল্ম সোসাইটি যদি

'স্ট্রাইক', 'অক্টোবর' ও ইভানের দ্বিতীয় পর্ব দেখার ব্যবস্থা করেন তাহলে তাঁরা সমগ্র দেশবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র হবেন।

আইজেনস্টাইন সম্পর্কে এদেশের চলচ্চিত্র আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সঙ্গতকারণেই শ্রদ্ধাশীল ও উৎসাহী। কিন্তু আমাদের দেশের শিল্পী ও সাহিত্যিকদেরও তাঁর সম্পর্কে সতর্ক অনুধাবনার প্রয়োজন আছে। বিদেশে বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমের গুণী ব্যক্তিরা ভাবের পারস্পরিক আদান-প্রদানের মারফত নানাবিধ আন্দোলন সৃষ্টি করেছেন। আমাদের দেশে বর্তমানে নিশ্চিতভাবে চলচ্চিত্র, নাটক, চিত্রশিল্প ও সাহিত্যে কমবেশি পরিমাণে নতুন আন্দোলনের চেষ্টা চলছে। এঁদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও ভাবনার বিনিময় অবশ্যই সুফল আনবে। আইজেনস্টাইনের লেখা পড়লে, ছবি দেখলে বুঝতে পারি কি বিপুল গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে শিল্পীর পরিপ্রেক্ষিত রচিত হয়। আমার বিবেচনায় এতদ্দেশীয় প্রতিটি শিল্পীর পক্ষে একই কারণে আইজেন-স্টাইনচর্চা অপরিহার্য। শিল্পের রহস্য, যথার্থ বৈদগ্ধ্য এবং আঙ্গিক ও বিষয়ের পার্বতী-পরমেশ্বর সম্পর্ক সৃষ্টি আর যথার্থ প্রগতিশীল শিল্পের স্বরূপ আবিষ্কারে আইজেনস্টাইন আমাদের অন্যতম পথপ্রদর্শক হতে পারেন।

নির্বাক যুগে তোলা ব্যাটেলশিপের থেকে আধুনিক ছবি এবং ওডেসা নদীতীরের দৃশ্যে পেরাম্বুলেটর ব্যবহারের মতো কল্পনাশক্তির পরিচয় ফিল্মে আমি কমই দেখেছি। সরকারী আইনে নিষিদ্ধ এই ছবিটির সঙ্গীতাংশে জানি না কি যাদু আছে। ইভানে ছায়ার ব্যবহার ও পরিবেশ নির্মাণ অসামান্য। যেন এক ঐতিহাসিক মহাকাব্য দেখলাম। ইতিহাসকে শরীর নিতে দেখলাম। আর সর্বত্র কি ক্লাসিক বাঁধুনী ও দৃঢ়তা!

পরিশেষে একটি অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা করতেই হল। সম্প্রতি স্থানীয় দুটি পত্রিকায় আইজেনস্টাইন চিত্র-উৎসব প্রসঙ্গে বিস্ময়কর অর্বাচীন সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। আজ, ১৯৬১ সালে আইজেনস্টাইনের শিল্পের মহত্ত্ব সম্পর্কে এজাতীয় বাচালতা যে দেশবাসী হিসেবে আমাদেরও লজ্জিত করে—শুধু এইটুকু জানানোর জন্যই সমালোচনা দুটির উল্লেখ করতে হল। কি অমোঘ কারণে ইংরেজী ও বাংলাভাষায় প্রকাশিত প্রতিবেশী দুটি পত্রিকা প্রায় একই ধরনের অশালীন মন্তব্য প্রকাশিত করে—আমরা তা বুঝি।

সম্ভবত আইজেনস্টাইনও সমালোচনার উর্ধ্বে নন। তাঁর অবদান ও মহত্ত্ব সম্পর্কে নিশ্চয়ই বিচার ও বিশ্লেষণ আবশ্যক। আমরা সে আলোচনায় সোৎসাহে যোগ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু পৃথিবীর এই নবীনতম শিল্পমাধ্যমের তিনি যে এক প্রধান পুরোধা তা আজ আর নতুন স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে না।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।